দ্য ওয়ে কুকি ক্র্যাম্বলস

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১-২. রাত্রির অন্তিম প্রহর 2
৩-৪. নোরেনা চুপচাপ 57
৫-৬. এডরিসের প্ল্যান 93
৭-৮. পুলিশ আর গোয়েন্দা 139
৯-১০. এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে 161

১-২. রাত্রির অন্তিম প্রহর

০১.

রাত্রির অন্তিম প্রহর এখন শুরুর পথে।

প্যারাডাইস সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টার। নাইট ডিউটিতে তখন ছিলেন জো বেইগলার।

বয়স প্রায় তিরিশের ওপর, তবে বলিষ্ঠ চেহারা, পুলিশী গাম্ভীর্যের ছাপ মুখে সুস্পষ্ট।

একটা ফাইল সামনে নিয়ে তার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন বেইগলার, এই সময়ে তার টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা সরব হয়ে উঠল।

ভুরু কুঁচকে দেওয়াল ঘড়িতে একবার চেয়ে দেখলেন। রাত তিনটে বেজে পঞ্চাশ মিনিট। এই অসময়েও কোথা থেকে কার ডাক এল আবার?

রোমশ হাতে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকিয়ে অপ্রসন্ন কণ্ঠে সাড়া দিলেন : বেইগলার বলছি।

লাইনের ওপাশ থেকে ডেক্স সার্জেন্ট চার্লি ট্যানারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল :’মিঃ হ্যারী ব্রাউনিং তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করার প্রয়াসী জো।

নাম শোনামাত্রই বেইগলারের সব বিরক্তি, সব অপ্রসন্নতা কোথায় যেন নিমেষের মধ্যে উবে গেল। যে সে মানুষ নয়, এই শহরের মেয়র আর তাদের বড়কর্তা, মিঃ টেরলের বিশেষ বন্ধু তোক। তাছাড়া প্যারাডইস সিটির সবচেয়ে মূল্যবান আর খানদানী তিন তিনটে রেস্তোরাঁর একজন মালিক রূপে জনমানসে তিনি পরিচিত। তাই হ্যারী ব্রাউনিং এর নাম কানে যেতেই বেইগলারকে যথেষ্ট মাত্রায় সতর্ক এবং ঐ সঙ্গে সচেতনও হতে হলো সতর্কতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে।

লাইন দাও। চার্লিকে বললেন তিনি আর শোন, কাউকে দিয়ে একপট কফি পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দাও, গলাটা কেমন শুকনো শুকনো ঠেকছে।

-ওকে।

একটু পরেই লাইনে এলেন হ্যারী ব্রাউনিং।

কে? বেইগলার তো? ভারী ভরাট গলায় গাম্ভীর্য কণ্ঠস্বর।–

আজ্ঞে হ্যাঁ চিনতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি।

-না, না, শোন, একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছি যে বলার নয় হে ভায়া। আমার রেস্তোরাঁয় একজন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আমি চাই তুমি যতো তাড়াতাড়ি পার এখানে এসে এই গোলমেলে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে যা কিছু করার তাই কর। তুমি এলে আমিও নিজেকে এই ঝামেলার হাত থেকে মুক্ত করতে পারব। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথা কিন্তু স্মরণে রেখো বেইগলার এই ব্যাপার নিয়ে চারিদিকে হৈচৈ

হোক, কাগজে কাগজে ঢি ঢি পড়ে যাক–এ আমি কখনোই চাই না। কারণ এই ব্যাপারটা এতই সাংঘাতিক যে কাগজে এই ঝামেলার সম্বন্ধে প্রকাশ হওয়ামাত্র আমার রেস্তোরাঁর নামটাও ঐ সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। তুমি ব্যাপারটার গভীরতা কিছুটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছ? এ আমার বাসনা নয়। তুমি এসে তোমার করনীয় কাজগুলো করে নেবে, আমার বলার কিছু থাকতে পারে না। তুমি আসবে, রিপোর্ট নিয়ে নেবে...লাশ তুলে নিয়ে যাবে। ব্যস! এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই মুখরোচক খবর যদি কোনভাবে তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বাইরে চলে যায়, তবে কিন্তু কাউকে আমি ছেড়ে কথা বলব না। আই অ্যাম ক্লিয়ার?

বেইগলার বিরস আর শুকনো কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, বুঝেছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এ খবর আমি থাকতে বাইরে যেতে দেব না।

–লাশ নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর আমার নির্দেশমতো কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব এ খেয়াল তোমার মাথায় কী করে এল হে?

লাইন কেটে গেল টেলিফোনের।

বেইগলার কয়েক সেকেন্ড বিতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন টেলিফোন রিসিভারটার দিকে, তারপর কী ভেবে ক্রশবার ঠোকাঠুকি করে ডাকলেন চার্লি ট্যানারকে।

–চার্লি! একবার দেখে নাও তো, তোমার আশেপাশে কোন খবরের কাগজের সাংবাদিক ঘর আলো করে বসে আছে কিনা।

–জাস্ট এ মিনিট, বলে চার্লি থামলেন। একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল : একমাত্র প্যারাডাইস সান-এর বার্ট হ্যাঁমিল্টনই যা উপস্থিত রয়েছে স্বশরীরে। ব্যাটাছেলে এক বোতল বীয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে বেঁহুশ হয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

— কেন? কী ব্যাপার?

–তা আছে বটে, কোন ব্যাপার। এক্ষুনি একবার আমাকে বেরোতে হবে। নীচে আজ কারা ডিউটিতে আছে বলতে পার?

-হ্যাঁ, মানড্রেক আর জ্যাকসন। মানড্রেক অবশ্য কফির সন্ধানে বাইরে গেছে।

ঠিক আছে, তাহলে জ্যাকসনকেই না হয় পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। ও নিজে এসে আমায় রিলিভ করবে। ভালো কথা, হেস্ আছে, না চলে গেছে?

আছে তবে সেই কখন থেকে মার মার করে যাচ্ছে।

–ওকে উঁড়াতে বলল। আমি যাচ্ছি, ও আমার সঙ্গেই বেরোবে।

ফেড হেস–হোমি সাইড ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। ছোটখাটো ভারিক্কী চেহারার মানুষটি হলে হবে কি যেমনি বুদ্ধি তেমনি চাতুর্যে ভরপুর তার মস্তক।

বেইগলারকে গম্ভীরমুখে চুপচাপ ড্রাইভ করতে দেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেলেন ব্যাপারটা খুব সুবিধেরও নয় আবার সামান্যও নয়। অনেকটা পথ পেছনে ফেলে আসার পর তিনি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় কোন উদ্দেশ্যে চলেছি আমরা?

আমাদের গন্তব্যস্থল হল হ্যারী ব্রাউনিং-এর রেস্তোরাঁ—

লা-কোকাইল-এ।

-খুনের ব্যাপার নাকি?

–সঠিক ভাবে এমুহূর্তে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলতেও চাননি, আমিও জানার জন্য আমার কৌতূহল প্রকাশ করিনি। তবে ফোনে কথা বলে মনে হল হ্যারী ব্রাউনিং এর এ ব্যাপারে কথা বলার কোন ইচ্ছা নেই। জানো নিশ্চয়ই, উনি এ শহরের একজন গণ্যমান্য প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি। আমাদের ওপর মহলের বড়কর্তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি নিজ মুখে যখন কিছু বললেননা,তখন ভাবলাম ঘটনাস্থলে পৌঁছেই দেখতে পাব–আসলেকীব্যাপার। তাইতো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

হেস আর কথা বাড়ালেন না।

পুলিশের কার এসে থামল লা-কোকাইল' রেস্তোরাঁর দোরগোড়ায়। নানা রঙ-বেরঙের বাহারীফুল আর পামগাছের সেরা টব দিয়ে মোড়া সুসজ্জিত সাজানো চমকপ্রদ ইন্দ্রপুরীর মতো জায়গা। রাত আড়াইটে নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়, লোকজন, গাড়ী আর আলোর অভাবে অনেকটাই সুনসান আর নিষ্প্রভ।

এঁদের অভ্যর্থনার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য লবিতেই অপেক্ষা করে বসেছিল ফ্লোর ম্যানেজার স্বয়ং লুই। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ আর অভিজাত চেহারা। মুখ ভাবলেশহীন, নিরুত্তাপ কিন্তু তার চক্ষু জোড়া সর্বদাই সজাগ।

লুই এঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এল মনিবের কাছে। রেস্তোরাঁর দোতলায় বার কাউন্টারের ধারে একটা টুলের ওপর চুপচাপ বসেছিলেন তিনি। হাতে ধরা ব্রান্ডির গ্লাস, মুখে জ্বলন্ত ধূমায়িত সিগার। ভারিক্কী চেহারা, বয়সে প্রবীন বছর পঞ্চান্ন হবে প্রায়, মাথা ভরা টাক। পরনে মহার্ঘ পরিচ্ছদ, বাটনহোলে একটা সাদা ধবধবে কার্নেশান ফুল গোঁজা। ভদ্রলোককে দেখলেই মনে হয় ঐশ্বর্য, শক্তি, দম্ভ আর নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি।

সৌজন্য বিনিময়ের পর বেইগলার তৎপর হয়ে উঠলেন তাঁর কাজের ব্যাপারে। মহিলার লাশ কোথায়–বেইগলার জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে মিঃ ব্রাউনিং প্রত্যুত্তরে কোন জবাব না দিয়ে শুধু চোখ তুলে তাকানে লুই-এর দিকে। লুই কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে বলল, আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

লুইকে অনুসরণ করতে করতে তারা এসে পৌঁছে গেলেন সেই হলঘরের শেষের একটা ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ কিনা বাইরে থেকে তা ঠিক বোঝা গেল না সামনে লাল ভেলভেটের একটা ঝুলন্ত পর্দা থাকায়।

বেইগলার আর হেকে দাঁড় করিয়ে লুই সেই পর্দাটা এক হাতে তুলে ধরল একপাশে।

অন্ধকার ঘর, বাইরের আলো ঘরে যেটুকু আলো ছড়াল তা পর্দা তোলার দরুণ। এরপর যে দৃশ্য তাদের সামনে ধরা দিল তা এক মহিলার, স্বর্ণকেশিনী এক সুন্দরী মহিলার দেহ সামনের টেবিলে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে। পরনে সাদা ব্যাকলেস সান্ধ্য পোশাক। পাশেই একটা লেডিজ হ্যান্ড ব্যাগ।

বেইগলার লুইকে বলে উঠলেন, এখানে আরো একটু জোরাল আলোর ব্যবস্থা করা যায় না?

মিঃ ব্রাউনিংও এসেছিলেন ওদের অনুসরণ করেই। তিনি নির্দেশ দেওয়ামাত্রই লুই সেই ঘরে প্রবেশ করে সুইচ টিপে সবগুলো আলো জ্বেলে দিল এক এক করে। সারা ঘর এখন আলোয় ঝম করছে।

মহিলার অচৈতন্য দেহ দেখে খুব ভালো ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে দেহে আর প্রাণের স্পন্দন নেই, তবু পুলিশী কেতা অনুযায়ী বেইগলার এগিয়ে গিয়ে প্রাণহীন দেহটা একবার পরীক্ষা করে দেখলেন।

হেসে বলে উঠলেন, লাশটার কোন ব্যবস্থা করার আগে এর কতগুলো ছবি নেওয়া দরকার।

হেসের কথায় বোমার মত ফেটে পড়লেন মিঃ ব্রাউনিং–যা কিছু করণীয় তা মর্গে নিয়ে গিয়ে কর, এখানে ওসব ছেলেখেলা আমি কখনই বরদাস্ত করব না। কারণ আমার সময়ের যথেষ্ট দাম আছে।

বেইগলার! তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে লাশ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। তোমাদের এই ছেলেমানুষি কর্মকাণ্ডের ফলে আমার এই ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যবসায় যদি বদনামের কোন আঁচড় লাগে তবে তোমাদের কাউকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র আমি নই, তা স্মরণে রেখ। নাউ গেট আর আউট অফ হিয়ার, বয়েজ!

একেবারেই অসম্ভব! লাশের ছবি না তোলা পর্যন্ত লাশকে নড়ানো এক কথায় বে-আইনী।

হে দৃঢ় কণ্ঠে আরো বললেন, কে বলতে পারে এটা কোন খুনজনিত ব্যাপার নয়?

জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে মিঃ ব্রাউনিং তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে হে বাপু তুমি? আমার সামনে এই অযৌক্তিক আইনের বুলি আওড়াচ্ছ?

বন্ধুর এই সমূহ বিপদের আশঙ্কা করে বেইগলার আর চুপ থেকে এই তামাসা দেখতে চাইল না। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পরিস্থিতি কিছুটা হালকা করার জন্য বলল, ওঁর নাম ফ্রেড হেস...উনি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। হেস যা বলেছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার। ধারণা ঠিকও হতে পারে স্যার, এটা একটা খুনের মামলাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে...

ব্রাউনিং তার গ্রানাইট পাথুরে গড়ামুখের ওপর একটা দৃঢ়তার আবরণ টেনেততোধিক দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ব্যাপারটা দেখে কখনই মনে হচ্ছে না এটা কোন খুনের মামলা। খুবই সাদাসিধে সাধারণ আত্মহত্যার রহস্য। পূর্ণবাক্যে বলতে গেলে বলতে হয়, দিস ইজ সুসাইড! ঐ দেখ টেবিলের তলায় এখনও পড়ে আছে একটা হাইপোডার্মিক

সিরিঞ্জ সঁচসমেত, আর মেয়েটার মুখের আকৃতি একবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ– পূর্বের মুখশ্রীর প্রকৃত রঙ এখন বিবর্ণ হয়ে নীল রঙে রূপান্তরিত হয়েছে। ওভারডোজ হেরোইনই ওর মৃত্যু ডেকে এনেছে।

মেয়েটি নেশা করত একথা এই দৃশ্য দেখার পর সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে। এই সাধারণ ব্যাপারটাকে কেন যে তোমরা এতো গুরুত্ব দিচ্ছ কে জানে। সহজ সাধারণ একটা আত্মহত্যার রহস্য তোমাদের মগজে ঢুকছেনা কেন?মাথামোটা কেমন ধরণের পুলিশ হে তোমরা? এই মগজ নিয়ে তোমাদের আবার এতো মাথা ব্যথা। নাউ গেট আর আউট অফ হিয়ার।

ব্রাউনিং-এর কথামতো বেইগলার আবিষ্কার করলেন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ নিডিল সমেত টেবিলের তলা থেকে। মৃতার মুখের অস্বাভাবিক নীলচে ভাব তার দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করল। তিনি নিখুঁত ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল ব্রাউনিং এর অনুমান মিথ্যে নয়।

তবু

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেইগলার শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি যা বললেন তা পুরোপুরি সত্যিও যেমন নয় তেমনি মিথ্যা বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। মৃতদেহ দেখে আত্মহত্যাও মনে হতে পারে আবার খুনও হতে পারে। কারণ এমনও হতে পারে কেউ ওঁকে জোর করে হয়তো ওভার ডোজ হেরোইন ইনজেক্ট করে তাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছে।

–কে আবার মেরে ফেলবে? মেয়েটি একাই এখানে এসেছিল আর সারাক্ষণ ধরে সে এই ঘরে একাকীই ছিল। অধীর কণ্ঠে এই কথা বলে ফেললো মিঃ ব্রাউনিং। অনেক হয়েছে, এবার তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাশ এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। দিনের আলো ফোঁটার অপেক্ষায়। আমি আর অযথা সময় ব্যয় করতে চাই না। তোমাদের সঙ্গে অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়ার কোন হীনতম প্রবৃত্তি আমার নেই।

–না স্যার, তা হয় না। যতক্ষণনা আত্মহত্যার ঠিক ঠিক প্রমাণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে লাশ সরাবার কোন ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। আইনের চোখে এটা গুরুতর অপরাধ। ওপর ওয়ালার কাছে যখন ডাক পড়বে তখন আমরা কী জবাবদিহি করব তা আপনি বলতে পারেন? আপনি একবার বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা। বেইগলার শান্তকণ্ঠে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করলেন।

ব্রাউনিং-এর দুই চোখ রাগে ধিকিধিকি করে জ্বলছে। উত্তপ্ত কণ্ঠে তিনি যে কড়াকড়া বুলি আওড়ালেন তা হল, তোমাদের মতো এমন অবাধ্য আর নির্বোধ পুলিশ অফিসারের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা এখান থেকে বিদায় নিতে পার।লুই!পুলিশ-চীফ ক্যাপ্টেন টেরলকে ফোন করে একবার ডেকে পাঠাও। এ বিষয়ে তার সঙ্গেই সরাসরি যা বলার আমি তাকেই বলতে চাই।

লুই তাড়াতাড়ি চলে গেলে বেইগলার ব্রাউনিং-এর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি অনর্থক আমাদের ওপর চটে যাচ্ছেন স্যার। পুলিশী তদন্তের এটা অন্যতম রীতি। অবশ্য স্বয়ং

চীফ যদি বন্ধুত্বের খাতিরে অন্য কিছু নির্দেশ প্রদান করেন, সেকথা আলাদা। আচ্ছা, এখানে আর কোন ফোন আছে নাকি? একবার ব্যবহার করতাম তাহলে।

তোমাদের চীফের সঙ্গে আমার কথোপকথন না হওয়া পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারবে না, বুঝেছ? এটা আমার হুকুম বা নির্দেশ যা তুমি মনে কর তা করতে পার। কথা, শেষ হলে রাগে গর্জন করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন বার কাউন্টারের দিকে। বেচারি বেইগলার,কী আর করেন?বন্ধু, সহকর্মী হেস্ত্রে দিকে তাকালেন নিরুপায়ের দৃষ্টি নিয়ে, তারপর আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনঃসংযোগ করলেন মৃত মহিলার নিঃসাড় অসাড় দেহে। সামান্য পরীক্ষার পর সহজে যে ব্যাপারটা মনকে বেশী উতলা করল তাহল মিঃ ব্রাউনিং-এর অনুমান অমূলক নাও হতে পারে। কারণ, মহিলার দু-হাতেই সঁচে বিধ্বস্ত করা অজস্র দাগ। অর্থাৎ মহিলা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট।

মহিলার পাশেই পড়েছিল তার সাদা ও সোনালী ব্রাকেডের সান্ধ্যকালীন ব্যাগ। সেটা তুলে নিয়ে খুলে একবার চোখ বোলালেন হে। প্রসাধন সামগ্রীর সঙ্গে একটা খাম নজরে এল তার। মুখ খোলা। হে খামের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটা চিরকূট এনে বার করে সন্তর্পণে। পড়েও ফেললেন এক নিমেষে। তারপর বেইগলারের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, চিঠিটা আমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। একবার পড়ে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না।

বেইগলার হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন—

পুলিশ ডিপার্টমেন্ট,

আপনারা ২৪৭, সীভিউ বুলেভার্ডে চলে যান। সেখানে আর একজনের দেখা পাবেন আপনারা। তার প্রাপ্য সাজা সে আমার কাছ থেকেই পেয়ে গেছে। গ্যাস চেম্বারের কষ্ট লাঘব করার জন্য শর্টকাটই বেছে নিলাম ঐ মুহূর্তে মাথায় যা এল।
মুরিয়েল মার্শ ডেভন

পুনঃ–ও বাড়ির চাবি আপনি দরজার সামনে বিছানো মাদুরের তলায় পেয়ে যাবেন।

বেইগলার কোন মন্তব্য করার পূর্বেই বার কাউন্টার থেকে ব্রাউনিং-এর গলা শোনা গেল, ওহে বেইগলার, তোমাদের চীফ তোমায় একবার ডাকছেন।

চিঠিটা হাতে নিয়েই বেইগলার ছুটলেন ফোন ধরতে। রিসিভারটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়েই ব্রাউনিং কয়েক পা তফাতে সরে দাঁড়ালেন।

–আমায় ডাকছেন, চীফ?

আজ্ঞে, মিঃ ব্রাউনিং-এর ফোন পেয়ে আমি এখানে এসেছি। মহিলার লাশ ওপর ওপর দেখে মনে হয় আত্মহত্যা। ওভারডোজ হেরোয়িনের রি-অ্যাকশন। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জও একটা পেয়ে গেছি তার বড়ির কাছ থেকে। শরীরের বেশকিছু জায়গা জুড়ে ইনজেকশান নেওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। আর সেই সঙ্গে হাতে এসেছে একটা সুইসাইড নোট।

তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা।

মিঃ ব্রাউনিং-এর কানে যেন কোন কথা না পৌঁছয় বুদ্ধি করে বেইগলার নিম্নকণ্ঠে চিঠির বয়ান পড়ে শোনালেন চীফকে। আবার স্বাভাবিক কণ্ঠে নিজের মতো করে বলতে লাগলেন:মিঃ ব্রাউনিং এর মনোগত ইচ্ছা আমরা বিনা তদন্তেই এখান থেকে লাশ সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। আপনি। কী বলেন? তাকি উচিত হবে? আমার মতে এখানে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট স্কোয়াড পাঠানো প্রয়োজন।

মাঝে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর আবার বেজে উঠল মিঃ টেরলের গলা:তোমার সঙ্গে আর কে আছে?

হেস।

বেশ, লাশের ভার না হয় ওর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আর সময় নষ্ট না করে সোজা চলে যাও সীভিউ বুলেভার্ডে। টম লেপস্কিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে হাতে হাতে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে। আমি ব্রাউনিং এর রেস্তোরাঁয় বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি, ও-কে?

ও-কে চীফ। হাসিমুখে জবাব দিলেন বেইগলার। কিন্তু মিঃ ব্রাউনিং

ওকে বোঝাবার ভার আমার ওপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে তুমি আর দেরী না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় রওনা দাও।

–এক্ষুনি রওনা হয়ে যাচ্ছি, চীফ। ঘুরে দাঁড়িয়ে রিসিভারটা মিঃ ব্রাউনিং-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন বেইগলার, নিন কথা যা বলার আছে বলে ফেলুন, মিঃ ব্রাউনিং।

রিসিভারটা তার হাতে জোর করে ধরিয়ে দিয়ে ছুটলেন তিনি হেরে উদ্দেশ্যে।

হেসকে সব জানিয়ে বেইগলার যখন বাইরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা ফেলছেন, তার কানে এল, মিঃ ব্রাউনিং ক্রোধে মত্ত হয়ে তর্কের ঝড় তুলেছেন স্বয়ং চীফের সঙ্গে।

টিকি এডরিস, লা কোকাইল রেস্তোরাঁর ওয়েটার। মাঝারি গড়ন, বকেশ্বর। মাত্র সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা। দীর্ঘ আট বছর ধরে এই রেস্তোরাঁর কাজ করে আসছে সে। এতদিন ধরে তার কাজে কোন ত্রুটি দেখা যায়নি। তাই জনপ্রিয়তার শিখরে সে আজ সহজেই পৌঁছতে পেরেছে। শুধু তার দৈহিক খবতার জন্যই নয় রেস্তোরাঁর খরিদ্দারদের কাছেও সে ভাড় হিসেবে বিখ্যাত।

রাত আড়াইটে নাগাদ রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হলে সব কাজ সেরে, গুছিয়ে হিসেব জমা দিয়ে, নিজের কম্পার্টমেন্টে তার ফিরতে আরো দেড়-দুঘণ্টা দেরী হয়ে যায়। আজ সে যাবার জন্য জামা কাপড় পরিবর্তনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় ফ্লোর ম্যানেজার লুই এসে খবর দিল পুলিশ তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়, টিকি।

পুলিশ আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী? কেন? ওই মৃতা মেয়েটার ব্যাপারে বুঝি? ঠিক আছে, আমার যতটুকু জানা আছে, যা দেখেছি তাই খুলে বলব, এর বেশী আর কিছু আমার বলারও নেই কারণ এই পর্যন্তই আমার জানা।

বার-হল-এর একধারে ফ্রেড হেস আর স্বয়ং ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবি বসেছিলেন একান্ত পৃথক হয়েই। জ্যাকবির হাতে ধরা নোটবই আর পেন্সিল। এডরিস হেলতে দুলতে এখানে এসে উপস্থিত হল।

দুই ডিটেকটিভ এডরিসের চেহারা দেখে প্রথমে সত্যি সত্যিই হতবাক হয়ে গেলেন। একটা প্রচণ্ড হাসির রোল দুজনেরই বুক ঠেলে গলায় এসে ঠেকল। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সামলে নিলেন নিজেদের।

তুমিই মৃত মহিলাকে অ্যাটেন্ড করেছিলে? জিজ্ঞাসা করে উঠলেন হেস্।

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–কী নাম তোমার?

–আজ্ঞে, টিকি এডোয়ার্ড এডরিস।

–ঠিকানা?

—২৪ নং ইস্ট স্ট্রীট সীকোষ।

সীকোম্ব হল প্যারাডাইস সিটির উত্তর শহরতলী। শ্রমিক শ্রেণীর বেশীর ভাগ লোকেরই সেখানে নিবাস।

–ভদ্রমহিলা রাত ঠিক কটা নাগাদ এখনে এসেছিলেন বলতে পারবে?

–ঘড়িতে তখন ঠিক কটা বেজেছিল বলতে পারব না তবে এগারোটার কিছু পরেই হবে।

মহিলা কী এখানে একাই এসেছিলেন না সঙ্গে কেউ ছিলেন?

না, একাই এসেছিলেন।

–যে ঘরে এই মুহূর্তে তার মৃতদেহ পড়ে আছে, সে ঘরটা কী তার আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল?

–আজ্ঞে না, অত রাতে বিশেষ লোকজন বার হল থেকে তখন প্রায় বিদায় নিয়েছিল। সকলেই রেস্তোরাঁয় ভোজন সারার ব্যাপারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই বহু কামরাই খালি পড়েছিল?

–মহিলাকে কেমন দেখেছিলে? আই মিন সুস্থ না অসুস্থ?

–আজ্ঞে, যতদূর মনে আছে তাকে সুস্থই দেখেছিলাম।

–তারপর তিনি ঠিক কী কী করেছিলেন?

–সোজা তার কামরায় প্রবেশ করে একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে এটাই জানতে চাইলাম : তিনি কী কারো জন্য প্রতীক্ষা করতে চান? জবাবে শুধুমাত্র মাথা নেড়ে না বলে নির্জলা হুইস্কির অর্ডার দিলেন আমাকে। তার হাব-ভাব দেখে মনে

হল তিনি প্রাইভেসি চান। তার অর্ডার মতো হুইস্কি সার্ভ করে, পর্দা টেনে আমি অন্যত্র চলে যাই নিজের কাজ সারতে।

তারপর।

–আড়াইটে নাগাদ আমাদের রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেলে খদ্দেররা একে একে বিদায় নিতে শুরু করে দিল। আমি কামরায় কামরায় উঁকি দিয়ে আসতে আসতে যখন তার কামরার দোর গোড়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম তখন পর্দা টানা রয়েছে। বাইরে থেকে বেশ কয়েকবার সাড়া নেবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু পরিবর্তে জবাব না পেয়ে পর্দা তুলে দেখি ঐ অবস্থার সম্মুখীন।

–তাহলে তোমার বয়ান হলো : রাত ঠিক এগারটা থেকে আড়াইটে, এই সাড়ে তিনঘন্টা তুমি আর ওর ধারে কাছে যাওনি। তাইতো, কেমন?

-আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইসময় মিঃ ব্রাউনিং বললেন বন্ধুকে, আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম, ফ্র্যাঙ্ক। লু রইল ঐসব এখানকার কাজকর্ম সামলে নেবে। আজ যা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হলো, এতে না আমার ব্যবসায় লোকসানের কোন প্রতিফলন পড়ে। যত তাড়াতাড়ি পার এই সাফল্ড পুলিশী-তদন্ত শেষ করে ফেল বন্ধু। লুই বেচারিও মানুষ, ওরও তো বিশ্রামের প্রয়োজন।

-না, না, বেশীক্ষণ সময় নেবে না আমার লোকেরা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যেতে পার।

অতঃপর বন্ধুকে গুডনাইট জানিয়ে মিঃ ব্রাউনিং ধীর পদব্রজে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

মিঃ ব্রাউনিং চোখের আড়ালে যেতেই এডরিস বলে উঠল–হেস্ কে? মিঃ অফিসার!

আপনি যখন আমাকে প্রশ্ন করে বললেন–মহিলাকে আমি ঠিক কেমন দেখেছিলাম, তখন কিন্তু জবাবে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমাকে। কেন জানেন? মনিব আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই বাধ্য হয়ে আপনাকে মিথ্যে বলতে হয়েছিল। কেন না আমি সত্যি প্রকাশ করলে উনি অকারণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন আর আমার এই সাধের চাকরিটিকেও খোয়াতে হোত। এবারে না হয় সত্যি জবাবটাই দিয়ে ফেলি।

রাগে হেসের চোয়াল নিজের অজান্তেই শক্ত হয়ে উঠল। এডরিস আবার বলতে লাগল–ওঁকে যখন দেখলাম, আমার ধারণা হলো উনি নিশ্চয়ই কোন না কোন ঝামেলার সম্মুখীন হয়েছেন। কেন না, মুখের ভাব বিবর্ণ...দু চোখের চাউনিতে চাঞ্চল্যের ভাব...থর থর করে শরীর কেঁপে উঠছে...হাতের মুঠো মাঝে মাঝে খুলছেন আর বন্ধ করছে..নিজের মনেই বিড়বিড় করে চলেছেন...সঙ্গীন অবস্থার এই ভয়াবহ রূপ দেখে বুঝলাম যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে বসবেন উনি। এর আগেও এমন ঘটনার সম্মুক্ষীণ হয়েছি আমি, তাই পরিস্থিতির এই চেহারা কিছুটা নিজের দখলে থাকায় তাকে এই কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে হাতের কাছে হুইস্কির পাত্র রেখে ও দরজা ভেজিয়ে, পর্দা টেনে দিয়ে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেললাম। মনিব আমার চিরদিনই শান্তিপ্রিয় মানুষ। কোনরকম ঝুটঝামেলা কেলেঙ্কারী পছন্দ করেন না। একমাত্র তার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে

মহিলাকে ঐভাবে কামরায় আটক করে রাখলাম তখনকার মতো অবস্থার সামাল দেবার জন্য।

হেস আর জ্যাকোবি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করলেন সবিস্ময়ে। হে জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটিকে তুমি তবে আগে থাকতে চিনতে?

জবাব দেবার আগে এডরিস একবার দেখে নিল ফ্লোর ম্যানেজার লুই কোথায়? তার চোখে পড়ল, সে কিছুটা দূরে একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কীসের যেন আলোচনা করছে। অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে হেস-এর কথার জবাব দিল স্বরের তীক্ষ্ণতা কিছুটা নরম করে : আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনতাম। আমার উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টে উনি থাকতেন।

–একথা আগে আমার কাছে প্রকাশ করোনি কেন বাপদ?রাগে বিরক্ত হয়ে গালিগালাজ করে উঠলেন হেস।

–সে প্রশ্নতো আপনি আমায় করেননি অফিসার, এডরিস বোকার মতো মুখ করে নিরীহ সুরে জবাব দিয়ে বসল।

–হয়েছে, অনেক হয়েছে। এবার বলো কী জান তুমি ওঁর সম্বন্ধে। ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন হেস্?

-সত্যিকথা বলতে কী, মেয়েটি ভদ্রঘরের সন্তান হলেও ইদানিং তার চালচলন ঠিক ছিল না।

নেশা করা আর বেশ্যাবৃত্তি তার ছিল জীবিকা। গত আট বছর ধরে ওর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। শুধুই আলাপ। ওর আর আমার মধ্যে যা ছিল তা হল এক সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এর চেয়ে বেশীকিছুনয়।কারণ বলতে বলতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল এডরিস, আবেগশূন্য কণ্ঠে জানাল : আমার এই চেহারার মূর্তি দেখে কোন চক্ষুষ্মতী কন্যা আমার সঙ্গে কোন সাহসে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াসী হবে বলুন?মুরিয়েলও আমায় আর পাঁচজনের মতন কৃপাবর্ষণ করে কথালাপ সারত।

–কী কথোপকথন হতো তোমাদের?

-বলার মতো কিছু নয়, মুরিয়েল যখন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত তখন ওর ঘর সংসারের জন্য শোক অকারণে উথলে উঠত। মেয়ের কথা, স্বামীর কথা,সংসারের টুকিটাকি বিষয়ে কথা, কখনো কখনো তার বর্তমান প্রেমিকের কথাও শোনাত সাতকাহন করে।

হেস আর কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন এডরিসকে, এমন সময় লুই কাছে এসে বলল, মিঃ হে! আপনার টেলিফোন এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন হেস্ যাবার আগে এডরিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, সে যেন এখানেই থাকে, আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে তাকে।

বার কাউন্টারে এসে ফোন ধরলেন হেস –হ্যালো?

হেস্? আমি বেইগলার বলছি। চী আছেন?

–হ্যাঁ, কেন?

–তাকে গিয়ে শুধু বলো যে, মুরিয়েল মার্শের হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া চিরকুটের লেখা অনুযায়ী ২৪৭ নং সীভিউ বুলেভার্ডে এসে একজন পুরুষের লাশ পেয়েছি আমি। খুব কাছ থেকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচবার গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। আর শোন, তোমাকে আমার একটু প্রয়োজনে লাগবে। চীকে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় চলে এসো এখানে।

ও কে। বলছি তাকে। আজ সারা রাতটাই তাহলে আর দু চোখের পাতা এক করার কোন সম্ভবনাই নেই। চমৎকার!

হে রিসিভারটা ক্রডেলে সবে মাত্র রেখেছেন ঠিক সেই সময়ে দুজন সাদা কোট পরনে ইন্টার্ন একটা ভাজকরা স্ট্রেচার বয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

–ডেডবডি নিয়ে যেতে এসেছে অফিসার। একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

–দাঁড়াও, দেখছি ডাক্তারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিনা। এই বলে হে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে সেই কামরার দিকে পা বাড়ালেন। এডরিসের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, ঠিক আছে, টিকি। আজকের মতন তোমার ছুটি। আগামীকাল সকাল এগারোটা নাগাদ হেডকোয়ার্টারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ডেক্স সার্জেন্টকে শুধু এটুকু বলবে, তুমি মিঃ হেন্দ্রে সঙ্গে দেখা করতে চাও, কেমন?

টিকি মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল।

মুরিয়েল মার্শের মৃতদেহ যে কামরায় ছিল সেই কামরায় এসে হেস দেখলেন, ডাক্তার লোইসের কাজ প্রায় সমাপ্ত। তিনি পুলিশ চীফ টেরলকে সম্বোধন করে বলছেন, আমার

যা যা, করণীয় ছিল তা সবই হয়ে গেছে। লাশ এবার সরাতে পারেন। আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ আমার ফাইনাল রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

ডাক্তারের কথা শেষ হলে হে মুচকি হাসি হেসে বললেন, কাজ এখনই শেষ কী বলছেন, ডাক্তার? আরো একটা মৃতদেহ ২৪৭ নং সীভিউ বুলেভার্ডের এক অ্যাপার্টমেন্টে পড়ে আছে আপনারই পথ চেয়ে। এই মাত্র ফোনে এই কথা জানাল স্বয়ং জো। সেখানে যাবেন না?

টেরল প্রকৃত ব্যাপারটা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। জো এর কাছ থেকে শোনা বুলিগুলো হে পুনরাবৃত্তি করে গেলেন।

টেরল একবার মৃতা মহিলাটির দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখলেন। তার অসাড় দেহটা তখন মেঝেতেই পড়েছিল। সুন্দরী,সুঠাম দেহের অধিকারিনী,বয়স প্রায় চল্লিশ। যৌবন পূর্ণমাত্রায় ভরপুর, ভাটার টান তখনও এসে পৌঁছয়নি।

চীফকে কৌতূহলী ভরা চোখ নিয়ে মৃতার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হে তখন বলে উঠলেন এডরিসের আওড়ানো বুলিগুলো। টেরল নীরবে শুনে গেলেন সব ব্যাপার। তারপর এও বললেন, ম্যালকে এখানে দায়িত্বে ন্যস্ত করে জো-এর কাছে চলে যাই।

চলুন।

মুরিয়েল মার্শ-এর চিরকুটের বয়ান মতোই ২৪৭নংসীভিউ বুলেভার্ডের গৃহে উপস্থিত হলেন জো-বেইগলার। এই এলাকায় ধনিক শ্রেণীর লোকের বাস। তাই গৃহগুলোর মূল্যও

যথেষ্ট, সুদৃশ্য এবং বিলাসবহুল। ২৪৭নং গৃহ একটা বাংলো আকৃতির ভিলা। সামনে কয়েক ফালি বাগান, গৃহকে আজ অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। হয় বাসিন্দা নেই, না হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বেইগলার গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। তারপর গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে নিজের ফ্ল্যাশ লাইটটা টেনে হাতে নিয়ে ফটক খুলে ধীর পদব্রজে এগিয়ে গেলেন সদর দরজার দিকে।

দরজার সম্মুখে দড়ির বোনা মাদুর পাতা। চিরকুটের বয়ান অনুসারে এরই তলায় এই গৃহে প্রবেশের চাবি থাকার কথা।

আর ছিলও তাই। চাবি হাতে নিয়ে বেইগলার সর্বপ্রথমে কলিংবেল টিপলেন বার কয়েক সন্তর্পণে। কারো কাছ থেকে কোন সাড়া মিলল না। তিনি যখন এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হলেন যে, গৃহে কেউ উপস্থিত নেই ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি চাবিটা লাগালেন। নিঃশব্দে নীরবে খুলে গেল সদর দরজা। বেইগলার এক হাতে ফ্ল্যাশ লাইট আর এক হাতে নিজের সার্ভিস-রিভলবারটাকে মুঠোয় চেপে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন ভেতরে।

— ভেতরে পা রেখেই ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে তিনি এ গৃহের আলোর সুইচের সঠিক অবস্থান দেখে নিয়ে একটা সুইচে চাপ দিতেই প্যাসেজটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। এই প্যাসেজের দুই প্রান্তে দুই পাশে দরজা দুটি তার নজরে এল।

আপন মনেই কিছু ভেবে নিয়ে বেইগলার প্রথমে বাঁদিকের বন্ধ দরজাটা খোলার ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিলেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সুইচের সন্ধান করে আলো জ্বালাতেই

অনুধাবন করতে পারলেন নিঃসঙ্গ এক শয়নকক্ষ। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট শয্যা, তাতে সুন্দর করে চাদর বিছানো, বালিশ পাতা। কিন্তু নিজ অবস্থা ঘোষণা করছিল সেগুলো কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি প্রায় কিছু দিন যাবৎ। খাটের মাথার দিকে, পায়ের দিক বরাবর আর সিলিঙে প্রকাণ্ড ধরণের তিন তিনটে দর্পণ ফিট করা। দেয়াল ঘন সবুজ রঙের ওয়াল পেপারে মোড়া। চার দেয়ালের জায়গায় জায়গায় হাস্যমুখী নিরাবরণা, সুন্দরী লাস্যময়ী রমনীদের দেয়াল চিত্র টাঙ্গানো। আঁকা ছবি নয়–প্রকৃত ফটোগ্রাফ। ঘরের এক কোণে প্রমাণ সাইজের আলমারী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাল্লা একটু টেনে খুলতেই বেইগলার মুহূর্তের জন্য একটু থমকে গেলেন।

যুবতীদের বিবিধ অন্তর্বাস, যৌনচিত্র, বিভিন্ন ধরণের সঙ্গম-ভঙ্গীমার চিত্র, যৌনাচারের সময়ে ব্যবহৃত নানা প্রকারের সাজ-সরঞ্জাম–অর্থাৎ একজন বিকৃতকাম যৌন উন্মাদ পুরুষের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব রকমারি অদ্ভুত জিনিসে আলমারি বোঝাই।

বেইগলার বেরিয়ে এলেন সে ঘর থেকে। এবারে তিনি প্রবেশ করলেন পাশের ডানদিকের ঘরে। এ ঘরেও আলো ঢোকেনি। অগত্যা সুইচের সাহায্যেই আলো জ্বালাতে হল। আলো জ্বলে উঠতেই যে দৃশ্য তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল তাতে তিনি শুধু থমকেই যাননি, রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা একটা সিঙ্গল বেড খাট।খাটে বিছানোখবরের কাগজের ওপরহুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নিষ্প্রাণ দেহের এক মানুষ। পরণেনীল সাদা ডোরাকাটা পাজামা আর জ্যাকেট।

রক্ত শুধু অজ্ঞাত ব্যক্তির সর্বাঙ্গেই নয়, বিছানা, মেঝে এমনকি দেয়াল পর্যন্ত রক্তের বিন্দুতে ভরপুর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন বেইগলার সেই দরজার কাছেই। তারপর ক্ষণিকের বিহ্বলতা কাটিয়ে ধীর পদব্রজে এগিয়ে এলেন খাটের অভিমুখেই।

আগন্তুক বলশালী চেহারার অধিকারী। মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো পেশীবহুল কাধ,কালো চুল সেই সঙ্গে সরু গোঁফ। মুখশ্রী মন্দ নয়।

মিনিটখানেকের মতো মৃত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকার পর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন বেইগলার। খাটের পাশেই একটা টিপয়ের ওপর টেলিফোন। সন্তর্পণে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন লা-কোকাইলের উদ্দেশ্যে।

হেসের সঙ্গে কথা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই এ বাড়ির দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। বেইগলার বেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভ লেপস্কিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

-শুনলাম এখানে নাকি কী একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়েছে। চীফ তমাকে সাহায্য করার । জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। তা ব্যাপার কী?

বেইগলার দরজা বন্ধ করতে করতে জবাব দিলেন, খুন। একজনের লাশ পাওয়া গেছে এ গৃহে, এসো একবার দেখে যাও।

যে ঘরে মৃতদেহ পড়েছিল সেই ঘরে দুজনে এসে ঢুকলেন। লেপস্কি মৃত ব্যক্তির টুপিটা মাথার দিকে ঠেলে দিয়ে সামান্য বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আরে, এযে আমার পূর্ব পরিচিত জনি উইলিয়ামস্ দেখছি।

–তুমি তাহলে চেন এই আগন্তুক কে?

–হ্যাঁ, চিনি বৈকি, প্যালেস হোটেলের মাইনে করা নাচিয়ে। ও এখানে মরতে এসেছিল কেন?

হয়তো এটাই ওর ডেরা বা আস্তানা।

–কে খুনী হতে পারে, কিছু আন্দাজ করতে পারছ?

একটি মেয়ে নাম মুরিয়েল মার্শ। এই বলে সংক্ষেপে সব ঘটনার বিবৃতি লেপস্কির সামনে তুলে ধরল। তারপর দুজনে মিলে তল্লাশির কাজে নেমে পড়ল সমগ্র ঘরটার। খুঁজতে খুঁজতে হাতে মিলল একটা আটত্রিশ ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক। এটা পড়েছিল খাটের তলায়। মনে হয় খুনের হাতিয়ার। বেইগলার সেটা রুমালে মুড়ে নিয়ে নিজের পকেটে চালান করে দিলেন।

তাদের যৌথ তল্লাশীর সময়েই উপস্থিত হলেন পুলিশের ডাক্তার। বেইগলার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এবং লাশের সামনে হাজির করে সকৌতুকে বলে উঠলেন, এই ধরুন আপনার আমানত, এবার সামলান।

ডাক্তার গজ গজ করে নিজের মনেই বলে উঠলেন, রাত্রের শেষ প্রহরেই যত ঝামেলা জুটে গেল ভাগ্যে। একটু যে নিদ্রা নেব তার উপায় পর্যন্ত নেই।

বেইগলার বা লেপস্কি কেউই কোন মন্তব্য করলনা শুধু নিজেদের মধ্যে সকৌতুক দৃষ্টি বিনিময় করে, ঘর থেকে বেরিয়ে এই গৃহের কম্পাউন্ডে এসে দাঁড়ালেন।

লেপস্কি চিন্তিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এই খুনের পেছনে কোন উদ্দেশ্য তো থাকবে? ঝগড়া ঈর্ষা? কিন্তু অত সামান্য কারণেও তো কেউ কাউকে এভাবে নৃশংসরূপে গুলি করতে পারে না। এ যেন মনে হচ্ছে কোন কিছু ব্যাপার নিয়ে মেয়েটা তার মনের আক্রোশ বর্ষণ করেছে লোকটার ওপরে। তোমার কী মনে হয়?

বেইগলার জবাব দেবার পূর্বেই মিঃ টেরল তার দলবল সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেলেন সেখানে। আধঘণ্টা পরের কথা

যা দেখার ছিল তা একে একে দেখে নিয়ে মিঃ টেরল তার গাড়িতে বসে পাইপ টানতে টানতে প্রতীক্ষা করছিলেন তার সঙ্গীদের কাছ থেকে রিপোর্টের জন্য। ডাক্তার উপস্থিত হলেন। তিনি জানলেন : রাত দশটার কিছু আগে পরে গুলি করা হয়েছে।

পাঁচটা বুলেটই হৃদযন্ত্রকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আর গুলিও করা হয়েছে খাটের পায়ার খুব কাছ থেকেই। অর্থাৎ গুলির প্রবেশ পথের গতি নীচ থেকে ওপরে। বিস্তারিত রিপোর্ট আগামীকাল সকাল এগারোটা নাগাদ পেয়ে যাবেন চীফ। এখনকার মতো তাহলে বিদায় নিই।

ডাক্তার চলে গেলেন নিজের গাড়িতে চেপে। টেরল অতঃপর নেমে এলেন গাড়ি থেকে। গৃহের ভেতরে পা রাখলেন। হলঘরে বেইগলার আর হেস কথালাপ সারছিলেন নিজেদের মধ্যে। চীফকে আসতে দেখে হেস্ বলে উঠলেন, এখনকার কাজ আপাততঃ শেষ, স্যার। একেবারে ওপেন অ্যান্ড শর্ট মার্ডার কেস।

টেরল বললেন, তাতেইতো আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে খুব বেশী করে। শোন, তোমরা দুজনে মিলে ইস্ট স্ট্রীটে ঐ মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাও। সুইসাইড নোটের সঙ্গে ওর হস্তাক্ষরও মিলিয়ে নিও একবার। বেঁটে গড়নের বকেশ্বরের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখ। আমার মন বলছে, ও অনেক কিছুই জানে, তাই ও যা বলেছে ওর বয়ান তার চেয়ে আরো অনেককিছুই মনে চেপে রেখেছে। হয়তো ওর পক্ষেই বলা সম্ভব, কি কারণে মেয়েটা তার মনে এতো আক্রোশ পুঞ্জীভূত রেখেছিল। যা যা বললাম তা ছাড়াও তোমরা নিজেরা যা পাবে জানবে বুঝবে সেসবের পরিপূর্ণ রিপোর্ট আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যেই আমি যেন পেয়ে যাই। বুঝেছ? নাও এবার চটপটু এখান থেকে যাবার ব্যবস্থা করে ফেল।

–ওকে চীফ।

টেরল এগিয়ে গেলেন সেই দিকেই, যেখানে লেপস্কি আর স্কোয়াডের নানান পারদর্শী ব্যক্তির দল নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

–টম! লেপস্কিকে ডেকে টেরল শুধু বললেন, এ গৃহে গুলি চালানোর আওয়াজ কারো কানে পৌঁছেচে কিনা আর জনি উইলিয়ামরে পূর্বের কিছু কথা, এ দুটি খবরের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিচ্ছি। অবিলম্বে খোঁজ-খবর নাও।

ও-কে, চীফ।

.

০২.

মিঃ টেরল আর তার লোকজন লো-কোকাইল রেস্তোরাঁ ত্যাগ করে চলে যাবার পর এডরিসকে আর কোন প্রয়োজনে লাগবে না দেখে জ্যাকবি তাকে চলে যাবার অনুমতি দিলেন।

রেস্তোরাঁর পেছনের দিককার স্টাফ কার পার্কিং জোনে মাত্র দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই সময়ে। একটা কুপারমিনি, আরেকটা বুইক রোডমাস্টার ককভর্টিবল।

বুইকের ড্রাইভিং সীটে বসেছিল জনৈক বৃষস্কন্ধ পুরুষ। তার পরণে ছিল ফন কালারের স্যুট আর মাথায় ব্রাউন স্ট্রহ্যাট। এক মাথা সোনালী কেশ। বয়স প্রায় আন্দাজ আটত্রিশ। সুদর্শন বলিষ্ঠ চেহারা। চিবুকের নীচে গভীর খাঁজ।

প্রথম দর্শনেই এটাই মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে লোকটি হয়তো কোন আইনজ্ঞ, ব্যাঙ্ক অফিসার, রাজনীতির কাণ্ডারী অথবা একজন অভিনেতা।

কিন্তু সে তার একজনও নয়।

লোকটির নাম ফিল অ্যালগির, একজন জেল খালাশি কয়েদী। নিজের চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অসাধারণ বাকপটুতার গুণে বহু লোককে প্রতারণা করে আত্মসাৎ করার অপরাধে ধরা পড়ে, চৌদ্দ বছরের জেল খাটার পর সম্প্রতি সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। জেল থেকে বেরোবার পর যখন অর্থের অভাবে কষ্টভোগ করছে, সেই সময়ে এডরিসের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়। এডরিস তাকে ভরসা দেয় : ফিল যদি তার নির্দেশমতো কাজ করতে প্রস্তুত থাকে তবে সে তাকে ছোট-খাটো রাজা বানিয়ে দিতে পারবে। কাজটা যদিও কঠিন কিছু নয় শুধু বুদ্ধি আর স্নায়ুর জোর থাকলেই কাজ হবে।

কাজটাতে ঝুঁকি ছিল নিশ্চয়ই তবে সামান্য চালের ভুল হলে গ্যাস-চেম্বার পর্যন্ত ঢুকতে হতে পারে, কিন্তু নিজের সাহস আর বুদ্ধিমত্তার ওপর ফিলের ছিল অগাধ আস্থা। তাই অনেক ভেবেচিন্তে রাজী হয়ে গেল সে এডরিসের দেওয়া প্রস্তাবে। অতঃপর তারা দুজনে মিলে মতলব এঁটে যে খেলা খেলতে ময়দানে নামল, আজই ছিল তার প্রথম রাউন্ড।

এডরিসের অপেক্ষায় গাড়িতে বসে সিগারেট টানতে টানতে সময় অতিবাহিত করছিল ফিল, এমন সময়ে এডরিস এসে তার গাড়িতে উঠে বসল। তাকে দেখে ফিল তাড়াতাড়ি সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমগ্র জানতে চাইল : এদিককার অবস্থার হালচাল?

–জলের মতন তরতর করে বয়ে চলেছে। জবাব দিল এডরিস।

-কোন ঝামেলা হয়নি, কেউ কোন এ বিষয়ে সন্দেহ করেনি। তারপর তোমার দিককার খবর কি? সব ঠিকঠাক তো?

–আপাততঃ সবকিছু প্ল্যান মতোই চলছে।

–গুড। পুলিশ বাংলোর দিকেই গেছে। তারপর আসবে ইস্ট স্ট্রীটে। তোমার পরের চাল কী হতে পারে, তা স্মরণে আছে তো?

হ্যাঁ, ফিল গাড়িতে চড়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।

-বেশ। তবে চলি এখন। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল এডরিস। তারপর বলল, টেরল একজন তুখড় পুলিশ অফিসার।

তাই সকাল সাড়ে সাতটার আগে কখনই স্কুলের ধারে কাছে যাবে না। সাবধান!

জানি হে বাপু, জানি। অত করে সাবধান না করলেও চলবে। তুমি আর আমি তোবদারই সেখানে গেছি। যাইনি? তাহলে ঘাবড়াবার আছেটাই বা কি? তুমি তোমার দিকটা দেখ? আমি দেখি আমারটা।

বলতে বলতে ফিল গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িটা বাঁক ঘুরে তার চোখের আড়াল হতেই, এডরিস গিয়ে তার নিজের মিনি কুপার খানিতে চেপে বসল। বিস্তর খরচ-খরচা করে নিজের এই খাটো আকৃতির চেহারা অনুযায়ী মিনি সীট, ব্রেক অ্যাকসিলেটার, গীয়ার ইত্যাদি নতুন করে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নিয়েছে সে নিজে উপস্থিত থেকে। পরিশ্রম করে ড্রাইভিংটা আয়ত্ত করেছে ভালোভাবে। এখন সে একজন দক্ষ ড্রাইভার।

গাড়ি চালিয়ে, কতকটা ইচ্ছে করেই ২৪৭ নং সীভিউ বুলেভার্ডের বাংলোর সামনে দিয়ে নিজের ডেরা ইস্ট স্ট্রীটে ফিরল এডরিস। আড়চোখের দৃষ্টি দিয়ে একবার দেখে নিল পুলিশ কারগুলোর দিকে–সেগুলো সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলবাংলোর সামনে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে পোশাক-আশাক ছেড়ে প্রথমে জলে গা ভিজিয়ে নিল। তারপর এক গ্লাস হুইস্কি হাতে নিয়ে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে আরাম করে সোফায় গিয়ে বসল।

ঘরটা খুব সাজানো-গোছানো। ফার্নিচার যা ছিল সবই প্রমাণ মাপের। শুধু সেগুলো যথাযথ ভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রতেকটির সামনে একটি করে ছোট টুল পাতা।

হুইস্কি আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের হাত ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখল এডরিস, ভোর সাড়ে ছটা। গ্রেটার মিয়ামিতে পৌঁছতে পৌঁছতে ফিলের ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যাবে। সব কিছু নির্বিবাদে চলতে থাকে, তবে প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে আসতে সাড়ে আটটা বাজবে ফিলের। তারপর প্ল্যান অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করে ফিলের খবর দিতে দিতে সাড়ে নটা দশটা তো বাজবেই।–মনে এগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

আরও একগ্লাস হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। কয়েক চুমুক দিতে না দিতেই সে শুনতে পেল সাইরেনের শব্দ তুলে পুলিশের একটা গাড়ি সশব্দে থামল তাদের বিল্ডিংয়ের নীচে। এডরিস তাড়াতাড়ি গ্লাস ফাঁকা করে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে এল। নিঃশব্দে পায়ে পায়ে বন্ধ দরজার কাছে এসে কপাটের গায়ে কান ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

এই গৃহের কেয়ারটেকারের কাছে মুরিয়েলের কামরার চাবি নিয়ে বেইগলার আর হেস সশব্দে ওপরে উঠে এলেন।

ওপরে এসে লক্ খুলে মুরিয়েলের টুরুম অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন গোয়েন্দা দুজন। সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত ঘর। প্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্রই মজুত আছে কামরাদুটিতে। ড্রেসিংটেবিল প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রীতে সজ্জিত ছাড়াও রূপোর তৈরী ডবল ফ্রেম-এ দুটো ফটোগ্রাফ : সেখানে রাখা ছিল। কালো চুলওয়ালা এক সুদর্শন যুবার, বয়স প্রায় ত্রিশের দোরগোড়ায়। দ্বিতীয়টি ষোলো সতেরো বছরের এক রমনীর। রমনীর মুখশ্রী যেমন অপরূপা তেমনি চোখদুটোও দুষ্টুমিতে ভরা।

যথারীতি তদন্ত তল্লাসীর পথে পা বাড়ালেন দুজনে। উল্লেখযোগ্য জিনিস কিছুই মিলল না। তবে কিছু টাকাপয়সা মুরিয়েলের কয়েকটি না দেওয়া বিল আর তার নামের কিছু চিঠিপত্র–যার শুরু ডিয়ার মমি দিয়ে, আর শেষ-ভালোবাসা নিও, নোরেনা বলে। পত্র প্রেরিকার ঠিকানা : গ্রাহাম কো-এড কলেজ, গ্রেটার মিয়ামি।

মুরিয়েলের ব্যক্তিগত নোটগুলোর সঙ্গে সুসাইড নোটে হস্তাক্ষর মিলিয়ে এটুকু স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল যে–একজনেরই হস্তাক্ষর।

বেইগলার বললেন, ড্রেসিং টেবিলের ওপর যে যুবতীর ছবি রয়েছে ঐ বোধহয় নোরেনা মুরিয়েল মার্শের কন্যা। কিন্তু পিতা কে? ছবির ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই নন।

হেস জাবাব দিলেন একটু ভেবে :বেঁটেটা জানলেও জানতে পারে। ওর সঙ্গে মুরিয়েলের একটা বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। চল, ওকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।

এ্যাপার্টমেন্টের দরজা পুনরায় লক করে ওঁরা এবার বিপরীতমুখী এ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ঘা দিলেন। একটু পরেই দরজা খুলে সামনে এল এডরিস।

–ও, আপনারা আসুন, ভেতরে আসুন। কফি তৈরী করছিলাম, তাই দরজা খুলতে একটু সময় লেগে গেল।

ভেতরে প্রবেশ করলেন দুজনে।

বসুন আরাম করে। কফি খাবেন তো?

–তা পেলে মন্দ হতো না। জবাব দিলেন বেইগলার। চারিদিকে ঘরের সাজসজ্জা চেয়েচেয়ে দেখতে লাগলেন। একটি ট্রেতে কফি নিয়ে উপস্থিত হল এডরিস।

কয়েক চুমুক কফি খাবার পর হেই সর্ব প্রথম থমথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন, তোমার সঙ্গে মুরিয়েল মার্শের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল, ওর শয়নকক্ষে ড্রেসিং টেবিলের ওপর যে যুবার ফটোগ্রাফ দেখলাম, সেটা কী ওর স্বামীর ছবি?

এডরিস বোকা নয়। বুদ্ধি তার মগজেও কিছু আছে। অতসহজে এই পুলিশের ফাঁদে পা দেবার পাত্র সে নয়।

সে উত্তরে শুধু বলল : কেমন করে জানব বলুন? আমি তো কখনও ওর ঘরে পা দিইনি।

হেস কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে বামনটাকে দেখলেন, তারপর নিজেই উঠে গিয়ে ফ্রেম সমেত ছবি দুটো নিয়ে এসে এডরিসের হাতে দিয়ে বললেন, দেখে বল।

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে এডরিস জানাল: না, এ মুরিয়েলের পতিদেবতার ছবি নয়। এরই সঙ্গে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে গেছিল। এর নাম হেনরি লিউইস। বছর পনেরো আগের কথা, এক মোটর দুর্ঘটনায় ছোকরা প্রাণ হারায়। তা দেখতে দেখতে এতোগুলো বছর কেটে গেছে।

এই মেয়েটি বোধহয় মুরিয়েলের মেয়ে?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, নাম নোরেনা।

বর্তমানে থাকে কোথায়?

–গ্রাহাম কো-এড কলেজ, গ্রেটার মিয়ামিতে। সেখান থেকে ও পড়াশুনা করছে।

–মুরিয়েলের স্বামী জীবিত?

–হ্যাঁ, বেঁচে আছেন।

–নাম জান?

–জানি। মেলভিন ডেভন।

–কোথায় বাস করেন ভদ্রলোক?

–সঠিক জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই শহরেরই কোথাও তিনি থাকেন।

–মুরিয়েলের গৃহত্যাগের কারণ কিছু জানা আছে?

–ভাসা ভাসা কিছু জানি–মানে যা শুনেছিলাম মুরিয়েলের মুখ থেকে তাই আর কি। মিঃ ডেভন খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির, কাজ পাগল মানুষ। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ নজর দিতেন না। এই নিয়ে মুরিয়েলের মনে দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিল না। বিয়ের বছর দুই বাদে এক পার্টিতে হেনরির সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। প্রাণচঞ্চল আর রোমান্টিক প্রকৃতির যুবক। ফলে প্রেমে পড়তে বেশী সময় লাগল না মুরিয়েলের। এরপর একদিন স্বামীর ঘর ছেড়ে সকন্যা মুরিয়েল হেনরীর সঙ্গে আবার নতুন করে ঘর বাঁধল।

হেনরীর সঙ্গে সুখশান্তিতে বেশ কয়েকবছর অতিবাহিত করেছিল মুরিয়েল। তারপর হঠাৎ একদিন কার অ্যাক্সিডেন্টে হেনরী মারা যায়। এ ঘটনা আগেই বলেছি, পনেরো বছর আগের।

হেস জিজ্ঞাসা করল, মুরিয়েল এতো কথা নিজমুখে তোমাকে বলেছে?

–হ্যাঁ, তবে একসঙ্গে নয়, বারে বারে, কিছু কিছু করে। কিছু আপনা থেকেই বলেছে আর কথায় কথায় নিজের অজান্তে বেরিয়ে পড়েছে। এই আর কি।

-তারপর?

-তারপর আর কি, হেনরীর যখন মৃত্যু হয় মুরিয়েল একেবারে নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য। তার মনোগত বাসনা ছিল, মিঃ ডেভনের নিকট থেকে ডিভোর্স পেলেই বিয়ে করে ফেলবে দুজনে। কিন্তু সে স্বাদ আর পূর্ণ হল না। অগত্যা শিশু কন্যাটিকে নিজের আপন পিতার কাছে রেখে মুরিয়েল একটা হোটেলে রিশেপসনিস্ট-এর কাজ নিল। মুরিয়েল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কুসংসর্গে পড়ে অধঃপতনের পথে পা ফেলল সে। নেশা করা ধরল–শুধু মদ নয়, মর্ফিন, হেরোইন ইত্যাদি নেশাও ছিল। যা ঘটার তাই ঘটল। চাকরিটা গেল। নিজেই বা কী খাবে আর মেয়ের মুখেই বা কী তুলে দেবে? পরিশেষে তাকে গনিকাবৃত্তির খাতায় নাম লেখাতে হল। চেহারা ভালো, রূপ যৌবন অটল ও অনড়, তাই পেশা জমে উঠতেও দেরী লাগল না। মেয়েকে বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে নিজেও চলে এল নিউইয়র্ক ছেড়ে এই শহরে। এখানেই পরিচয় হল জনি উইলিয়ামরে সঙ্গে।

এই পর্যন্ত বলে থামল এডরিস। বেইগলার আর হেরে কাপে আরো খানিকটা কফি ঢেলে দিয়ে বলল, আমার মনে হয়, এর পরের ঘটনা আমার চেয়ে জনিই ভালো বলতে পারবে। আপনারা বরং তার সঙ্গে একবার দেখা করুন।কারণ, সে আমার চেয়ে মুরিয়েলকে আরো অনেক কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছে।

হেস্ এবার নিজেই এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে তাতে দুএক চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, জনি এ জগতের মায়া ত্যাগ করেছে। মুরিয়েল তাকে ভবনদী পার করে দিয়েছে।

আচ্ছা এডরিস! তোমার বান্ধবী তোমাকে এতকিছু বলেছে, আর এই খুনের ব্যাপারেই মুখ খোলেনি?

এডরিস চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ বড় বড় চোখ করে। তারপর বলল, না, বলেনি। অবশ্য ওর হাবভাব থেকে শুধু এটুকু বুঝেছিলাম কিছু একটা কাণ্ড নিশ্চয়ই বাঁধিয়ে এসেছে মুরিয়েল। তবে কারো প্রাণ নিয়ে এসেছে তা বুঝতে পারিনি। কারণ ও মদ্যপানে আসক্ত ছিল তাই নিজের মধ্যে সে ছিল না। তবে জনির ভাগ্যে এরকম যে কিছু একটা ঘটবে তা জানাই ছিল। ব্যাটা নীচ, চুগলি খোর, কুত্তির বাচ্চা!

-এরকম একটা কিছু পাওনা জনির ভাগ্যেই বা ছিল কেন? কী করেছিল সে? জানতে চাইলেন বেইগলার।

–ও ব্যাটার জন্য মুরিয়েলকীনা করেছিল। ওর খাওয়া, থাকা, জামাকাপড়, বাবুয়ানার সমস্ত খরচ কিনা জুটিয়েছে মুরিয়েল। জনি ওকে প্রথম থেকেই জোঁকের মতন রক্ত চুষে চুষে খেয়েছে। মুরিয়েল কোন প্রতিবাদ জানায়নি, নিঃশব্দে সব সয়ে গেছে। শেষে ব্যাটা ওরই রোজগারের পয়সা নিয়ে প্যালেস হোটেলের এক আধবুড়ি নাচিয়ে মাগীর সঙ্গে ফুর্তিতে মেতে উঠেছিল। এ নিয়ে মুরিয়েল কিছু বলার জন্য উদ্যত হলেই মহা হম্বিতম্বির পাহাড় জুড়ে দিত ব্যাটাচ্ছেলে।

শেষে ছয়মাস ভীষণ কষ্টে দিন কাটিয়েছে মেয়েটা। ড্রাগের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছিল না, খদ্দেরও কমে আসছিল...নোরেনার স্কুলের ফিসবাকি পড়ে যাচ্ছিল, এমন আরও বহু সংকটের সম্মুক্ষীণ হয়েছিল সে।

ধার চেয়েছিল কিছু জনির কাছ থেকে। কিন্তু পরিবর্তে এক পয়সাও দিল না জনি, উল্টে নানা খোঁটা দিত মুরিয়েলকে।

নোরেনা জানে এসব?

না, মুরিয়েল তাকে কিছু জানায়নি। তার মা একজন গণিকা, এটাই তাদের জীবিকার একমাত্র পথ। এ সবকিছুই তার কাছে অজ্ঞাত।

-তা তুমিতো ওর প্রাণের বন্ধু ছিলে, তুমি আজ ওর এই দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে না কেন?

–আমি দিতে চাইলেও সে কখনই গ্রহণ করত না।

কেন?

এডরিসের মুখটা মলিন হয়ে গেল।

সে উদাস কণ্ঠে বলে উঠল, কারণ, সে আমায় মানুষ বলে গণ্যই করে না। আমায় কৃপা করত, করুণাও বর্ষণ করত কিন্তু কখনো সমকক্ষ বলে মনে করত না।

হেস্ আর বেইগলার আবার নিজেদের মধ্যে একবার চোখাচোখি করলেন। বেইগলার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল হে, এবার না হয় ওটা যাক টিকি। কফি খাওয়ানোর জন্য অজস্র ধন্যবাদ।

হেসও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। দুজনে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে হেস্ মৃদু হেসে বলে উঠলেন, ওহে বেঁটে বকেশ্বর! নিজের নাসিকাকে অপরিষ্কার রেখো না যেন, কিছু বুঝলে?

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তারা।

কয়েক মিনিট চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল এডরিস। তার মুখ রক্তিম, চোখ জোড়া উজ্জ্বল আর হাত মুষ্টিবদ্ধ।

ধীরে ধীরে সে ফিরে এল নিজের বসবার জায়গায়। ঘড়ি দেখল : সকাল সাতটা পনেরো। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল তারপর টেলিফোন স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে একটা বিশেষ জনের উদ্দেশ্যে ডায়াল ঘোরাল।

রিসিভারে ধ্বনিত হল একটি মহিলা কণ্ঠ : দিস ইজ গ্রাহাম কো-এড কলেজ।

-ডাঃ গ্রাহামের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। খুব দরকারী।

–আপনি কে কথা বলছেন?

আমাকে, আপনি চিনবেননা। আমি এডোয়ার্ড এডরিস। আপনাদের স্কুলের একজন ছাত্রী। মিস নোরেনা ডেভনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই ওর সঙ্গে। বিশেষ দরকার।

-একটু ধরুন তাহলে।

কয়েক সেকেন্ড পরে শোনা গেল ভরাট গলার পুরুষ কণ্ঠস্বর : দিস ইজ ডঃ গ্রাহাম।

ডাঃ গ্রাহাম? আমি এডোয়ার্ড এডরিস বলছি। ডেভন পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু আমি। নোরেনা আমার পরিচিত। নোরেনার মা এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। সিরিয়াস কেস। অবশ্য নোরেনাকে এতো কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই, অকারণে সে অস্থির হয়ে পড়বে। শুধু দুর্ঘটনার কথাটুকুই বলবেন। নোরেনার মা তার কন্যাকে দেখার জন্য খুব ছটফট করছেন। ওঁর অ্যাটর্নী মিঃ স্ট্যানলী টেরল এখন গ্রেটার মিয়ামিতেই আছেন। তাঁকেও এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি এখনি এসে পড়বেন। এটাই স্থির হয়েছে আমার সঙ্গে তিনি বোর্ডিং থেকে নোরেনাকে নিয়ে আসবেন, বুঝেছেন?

ডঃ গ্রাহামকে নিরুত্তর দেখে এডরিস আবার বলে উঠল, কী ভাবছেন, ডক্টর?

-নোরেনা কী মিঃ টেরলকে চেনে?

খুব সম্ভব নয়, তবে নামটুকু জানে বোধহয়। আমাকে খুব ভালো করে জানে ও পূর্ব পরিচিতি আছে আমার সঙ্গে নোরেনার। বুঝতেই পারছেন সমগ্র পরিস্থিতি। ভদ্রমহিলা মৃত্যুশয্যায়। মেয়েকে একবার শেষ দেখা দেখতে চান। আপনার যদি কোন আপত্তি থেকে থাকে তবে না হয় আমি যাই। কিন্তু এর ফলস্বরূপ যে সময়ের অপচয় হবে তার মধ্যে যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তবে দুপক্ষেরই আফশোষের আর সীমা থাকবে না, ডক্টর।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরেই গলা ঝেড়ে নিয়ে ডঃ গ্রাহাম জানালেন :ঠিক আছে, মিঃ এডরিস। আমি নোরেনাকে তার মার দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে তাকে পাঠাবার জন্য তৈরী করে দিচ্ছি। আর কিছু?

নো, থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।

সিরিভারটা যখন ক্রেডেলে রাখল এডরিস, তখন তার চোখে মুখে চাপা উল্লাসের ছাপ স্পষ্ট।

ডঃ গ্রাহামের অফিসে টেবিলের দুধারে মুখোমুখি বসেছিলেন ডঃ গ্রাহাম আরফিল অ্যালগির। ফিলের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ দামী এবং রুচিসম্পন্ন। সুশ্রী মুখে সময়নোচিত দুঃখের ছায়া।

ফিল বলছিল-মিঃ এডরিসের কাছে যে সংবাদ পেলাম, তাতে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে নোরেনা শেষপর্যন্ত তার মাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবেন কিনা। আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি নোরেনার যাবার ব্যবস্থা করে দেন ডঃ গ্রাহাম, তবে খুব উপকৃত হই।

-ও-তো তৈরীই ছিল। তবে এখনো আসছেনা কেন কে জানে? আচ্ছা, আমি একটু এগিয়ে দেখছি–

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবেন ডঃ গ্রাহাম, ঠিক সেই মুহূর্তে নোরেনা এসে প্রবেশ করল তার অফিস ঘরে।

পরনে কুচি দেওয়া ধূসর রঙের স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ, কালো টুপি, কালো মোজা আর কালো জুতো। হাতে ধরা ধূসর রঙের শার্ট কোট, চোখে চশমা।

নোরেনার দিকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল ফিল মৃদু করমর্দন করে কোমল কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না, নোরেনা। আমি তোমার মায়ের অ্যাটনী। কিছুদিন হল তিনি আমার ক্লায়েন্ট। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় এভাবে হবে আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। যাইহোক, এবার যাওয়া যাক, মিথ্যে সময় নষ্ট করে কী লাভ? পথও তো নেহাৎ কম নয়।

ফিল অ্যালগিরের বুইক যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলেছে গ্রেটার মিয়ামির হেভীট্রাফিক ভেদ করে। পাশাপাশি বসে নোরেনা আর ফিল। দুজনেই নীরব। নীরবতা ভঙ্গ করে নোরেনা খানিকটা ইতস্ততঃ হয়েই জিজ্ঞাসা করল : মাকি তখন নেশায় বেঁহুশ ছিলেন।

ফিল একটু অবাক হল নোরেনার এই রকম প্রশ্নের ধরন ধারণে। শুধু জানাল, মাতাল? তার মানে? ছিঃ নোরেনা, নিজের মার সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য করা শোভনীয় নয়।

নোরেনা কিন্তু ফিলের এই কথায় বিন্দুমাত্র লজ্জিত হল না দুঃখও পেল না। বরং– আবেগের বশে বলতে লাগল : এ পৃথিবীর যে কোন জিনিসের চেয়ে আমার মা আমার কাছে অনেক বেশী প্রিয়। আমি জানি আমার মা মদ খান, নেশাতেও আসক্ত। যদিও এই কথা কোনদিন তিনি নিজ মুখে আমার কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু এ সংবাদ আমার কানে এসেছে। শুধু তাই নয়, আমি জানি কেন আজ তিনি এই চরম দুর্দশার শিকার? আমাকে মানুষ করার জন্যে মা যে নিজেকে কতখানি উজাড় করে ফেলেছেন তা আর

কেউ না জানুক আমি জানি। নিজের এই রিক্ততা গোপন করতেই মদের গ্লাস আমার মা স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিয়েছেন। তাইতো জানতে চাইছিলাম,দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কি তিনি নেশার ঘোরে বেঁহুশ ছিলেন?

-না, অন্ততঃ এডরিস আমায় অ বলেনি। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাটা গেছে। যাই হোক তুমি এবার চুপচাপ লক্ষী মেয়ের মতো নিজের জায়গায় বসে থাক। বেশী কথালাপ হলে আমার গাড়ি চালানোর আর কিছু ব্যবসাগত ভাবনাচিন্তার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল, কেমন?

মিষ্টি মধুর সুরে হুকুম জারি করল স্বয়ং ফিল। কারণ, কথায় কথায় যদি বোস তার নিজের অজান্তেই নির্গত হয়ে আসে মুখ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী সেও তো বিশেষ কিছুই জানে না মুরিয়েল সম্পর্কে।

.

নিউইয়র্ক থেকে রাতের ফ্লাইটের প্লেন ঠিক ঠিক সময়ে এসেই মিয়ামি এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করল। সকাল তখন সাড়ে সাতটা। যাত্রীদের মধ্যে ছিল একজন সপ্তদশী তরুনী। রূপ আর যৌবন যেন উপচে পড়ছে তার সারা শরীর থেকে। মাথায় সাদা স্কার্ফ, পরনে সবুজ সোয়েড জ্যাকেট, কালো আঁটসাট প্যান্ট, গলায় গিট বাঁধা সাদা রুমাল। জ্যাকেটের সামনের দিকটা উন্মুক্ত। তার তলায় যে সাদা শার্ট ছিল তার দুপাশ দিয়ে উত্তেজক ভঙ্গিতে মাথা তুলে উঠেছিল সুগোল, সুগঠিত দুই সুঠাম স্তন। হাই হিল জুতো

পরে হাঁটার তালে তালে সে জোড়াও এবং নিতম্বও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছন্দে ওঠানামা করছিল।

তার এই ছন্দোময় চলন, চোখ ধাঁধানো রূপের ছটা,বুকে দোলা জাগানো যৌবন মাধুর্য দেখে আত্মহারা হয়নিঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেনি, এমন নর-নারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল এয়ারপোর্টে।

তরুণীর নামইরা মার্শ, মুরিয়েলের সবচেয়ে ছোট বোন। মানুষ হয়েছেব্রুকলীনের বস্তিতে। ইরার চেয়ে মুরিয়েল বাইশ বছরের বড়। মুরিয়েল যখন গৃহ ছেড়ে আসে, মার্শ পরিবারের জীবন থেকে মুছে যায় চিরদিনের মত,ইরা তখন পৃথিবীর আলো দেখেনি। এগারোজন ভাইবোনদের মধ্যে ইরা সর্বকনিষ্ঠা। চার ভাই মারা যায়, হয় দুর্ঘটনা না হয় মদ পান করে, মারামারি করতে গিয়ে ছুরি বা গুলিবিদ্ধ হয়ে।

দুজন ডাকাতির দায়ে সারা জীবনের সাজা মাথায় নিয়ে জেল খাটছে। মুরিয়েল আর তার তিন বোন বস্তির ঐ নরক জীবন পেছনে ফেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বৃহত্তর জীবনের বিভিন্ন পথে। একমাত্র মুরিয়েলই ক্ষণিকের জন্য দর্শন পেয়েছিল জীবনের উজ্জ্বল দিকটা। তারপর সেও তার আত্মীয় পরিজনদের মতো তলিয়ে যায় অতল অন্ধকার গহ্বরে। ইরার ভাগ্যে যে কী লেখা আছে তা এখনো অজানা। বর্তমানে এডরিসের কল্যাণে ইরা আজ জেনেছে তার বড় দিদির কথাকে সে জন্মের পর চোখে দেখেনি, শুধু মা বাপের মুখে এক আধবার তার নামটুকুই শুনে এসেছে।

মাস চারেক আগে পাবলিক বাথ থেকে যখন স্নান সেরে সদ্য ফিরে আসছিল ইরা, তার নজরে পড়ল তাদের গলির মোড়ে একটা লাল রঙের মিনি কুপার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইরা দেখেও না দেখার ভান করল। সে গাড়ির পাশ কাটিয়ে গলিতেই ঢুকতে যাবে সেই মুহূর্তে খুলে গেল বন্ধ থাকা গাড়ির লাল দরজা। ব্রাউন স্পোর্টস জ্যাকেট ও গ্রে ফ্ল্যানেল পরা এক অদ্ভুত রকমের বেঁটে লোক তিড়িং করে লাফিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে মুখ তুলে বলল, তুমি যদি ইরা মার্শ হয়ে থাক তবে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে এই ইরা। মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে দাঁড়ালো, সেই বেঁটে গড়নের বামনকে ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করে উপেক্ষার সুরে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি ইরা মার্শ। কিন্তু তুমি, তুমি কে? আমি পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে কোন অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করি না।

এডরিস হাসিমাখা মুখেই জবাব দিল, আমি তোমার দিদি মুরিয়েল মার্শের বন্ধু। তোমার দিদির ব্যাপারেই কথা ছিল। তাও কি শুনতে প্রস্তুত নও?

অচেনা ব্যক্তির মুখে দিদির নাম শুনে কেমন থতমত খেয়ে গেল ইরা। শুধু নাম ছাড়া দিদির, বাকি সবকিছুই ছিল তার কাছে অজানা। তাই এতো বছর বাদে সেই অদেখা অচেনা অজানা দিদির নাম শুনেও তার বিষয়ে কিছু কথা জানার সুযোগ পেয়ে, কৌতূহলী মন তা জানার জন্য উসখুস করছিল।

আশে-পাশে ততক্ষণে মানুষের ভিড় জমে উঠেছে ইরার মতন একজন অপরূপা সুন্দরী তরুণীকে আধবয়সী বেঁটে বামনের সঙ্গে পথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে। বেগতিক

দেখে ইরা চটপট মিনির দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে। ইঙ্গিত বুঝে এডরিসও সময় নষ্ট করল না গাড়িতে উঠে বসতে। তারপরেই ছুটে চলল লাল মিনি।

গলির মুখ ছাড়িয়ে বেশ ক্ষানিকটা পথ চলে আসার পর এডরিস বলল, আমার নাম টিকি এডরিস তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমি একটা কাজের ধান্দায় আছি, যা করতে পারলে আমরা দুজনেই লাভবান হতে পারব, হাতে কিছু মালকড়িও আসবে।

আমায় নিয়ে? আমায় চেন না জান না অথচ আমায় নিয়ে কাজের ধান্দায় আছ! আশ্চর্য!

এডরিস হেসে জবাব দিল: চিনতামনা একথা সত্যি এবার তো পরিচয়পর্ব শেষ। আর জানার কথা বলছ? আমি তোমার সম্পর্কে যা জানি, তুমি নিজেও তোমার সম্বন্ধে ততোখানি জান কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

কথা বলতে বলতে একটা নির্জন জায়গায় দেখে গাড়ি থামাল এডরিস।কথাটার মধ্যে কোথায় কোন মিথ্যা নেই, খুবই সত্যি। মাস খানেক আগে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় একদিন মুরিয়েল তার এই বোনের কথা বলেছিল এডরিসকে। সে বলেছিল : বোনটাকে আজ অবধি চোখের দেখাও দেখিনি আমি। সে যে এ পৃথিবীর আলো দেখেছে তাই জানতাম না। একদিন হোটেলে আমাদের পাড়ার বেশ কিছু লোক এসেছিল খানা-পিনার উদ্দেশ্যে। আমায় দেখে তারা বলাবলি করছিল ওর কথা। বলছিল আমাদের পাড়ার মার্শদের ছোট মেয়েটাকে অবিকল ঐ রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মতন দেখতে, তাই না? শুনে তো আমি হতবাক! আমার মেয়ের বয়সী যে আমার বোন থাকতে পারে এ ব্যাপারে আমি কোনদিন সত্য জানার জন্য আগ্রহী ছিলাম না।

কথাটা এডরিসের মনকে বেশ নাড়া দিল, তাই গেঁথেও গেল একেবারে। কারণ সে যে কাজের উদ্দেশ্যে ছিল তাতে একজন মেয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল। যে সে মেয়ে এই স্থানে বসার উপযুক্ত নয়। সে হবে চটপটে, সাহসী, চাতুর্যে ভরা আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করবে। বহু সন্ধান করেও এমন মেয়ে তার কপালে জুটছিল না। মুরিয়েলের কথা শুনে তার বোনটাকে একটু বাজিয়ে নিতে চাইল এডরিস। তাই সে বিলম্ব না করে, নিউইয়র্কের এক বে-সরকারী পেশাদার এনকোয়ারী এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের জানাল :ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী এক নারীর বর্ণনা কতকটা এই রকম : এখানে যে মুরিয়েলের একটি সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরল নাম ইরা মার্শ, নিবাস বর্তী অঞ্চল। তার সম্পর্কে আদ্যোপান্ত ভাল মন্দ সমস্ত সংবাদ চাই। ।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে এজেন্সীর দেওয়া একটা পাঁচ পাতার রিপোর্ট ছবি সমেত এডরিসের হাতে এসে পৌঁছল, রিপোর্ট পড়ে এডরিসের মন খুশিতে ভরে গেল। তার কাজের পক্ষেই এই মেয়ে উপযুক্ত।

তার প্ল্যানের বিরাট কঠিন বেড়ার প্রথম ধাপ যে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে গেল। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তার দুশো ডলার নিজের পকেট থেকেই ব্যয় করতে হয়েছে, তবে এই নিয়ে আফশোস করার মতন নয় সে। সে জানে এমন একটা সময় তার দ্বারে উপস্থিত হতে চলেছে। যে সময় দুশো গুণ টাকা পুনরায় তার পকেটে ফিরে আসবে স্ব-মহিমায়।

ইরা খুব জবরদস্ত মেয়ে (রিপোর্টে তাই বলছে) ছোট-খাটো চুরি চামারিতে পাকাঁপোক্ত সে। মোকামিন গ্যাঙের (পাড়ার উঠতি মস্তান তরুণদের দল) সঙ্গেও সে যুক্ত। এই

দলের সর্দার জে ফার নামের এক আঠারো বছর বয়সের তরুণ। ফারের বান্ধবীর নাম লিয়া ফ্লেচার। মনের সংগোপন আসনে ইরার কামনার পুরুষ ছিল এই ফার। লিয়ার তদারকীর জন্য কাছে যাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পেত না। ফারের কাছে যাওয়ার জন্য পথের কাঁটা লিয়াকে আগে সরাতে হবে। বারংবার হতাশা আর ব্যর্থতার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ইরা তার মনকে আরো দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পেরেছে, মনে মনে এক মতলব আঁটল ইরা।

গোপনে সে জেমকে এড়িয়ে একমাস ধরে কিছু ক্যারাটের প্যাঁচ শিখে নিল। নিজেকে সে লিয়ার একজন প্রতিপক্ষরূপে গড়ে তুলতে পারল। চ্যালেঞ্জ জানাল তার পথের প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী স্বয়ং লিয়াকে। এরপর আর কি?

একদিন একটা পরিত্যক্ত গুদাম ঘরে দলের প্রধান প্রধান সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে ফারকে পাওয়ার দাবী নিয়ে সম্মুখীন হল এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী। একমাত্র পরনের ভূষণ বলতে প্যান্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। থাকাটা নিয়মের মধ্যেও পড়ে না। শুরু হল লিয়া ও ইরার দ্বৈরথ সংগ্রাম–অবশ্যই উন্মুক্ত হস্তে।

সেই প্রচণ্ড সংগ্রামে ওদের হিংস্রতা আর তাণ্ডবতা দেখে দলের প্রায় সকলেই এমনকি যাকে নিয়ে এই তাণ্ডব নৃত্য স্বয়ং ফারও মাঝে মধ্যে এই ভেবে অস্থিত হয়ে পড়ছিল যে : এবার বুঝি মেয়েটা এই অল্প বয়সে বেঘোরে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়বে। কিন্তু বাধা দেবার নিয়ম ছিল না বলেই কেউ যুদ্ধ থামাতে এগিয়েও এলনা। শেষ পর্যন্ত ইরার গলায়ই জয়মাল্য উঠল। অবশ্য তার পুরস্কারস্বরূপ ফারকে নিজের প্রণয়ীরূপে পেলেও তাকে দিন পনেরো ডাক্তারের সেবা-শুশ্রূষায় থাকতে হয়েছিল।

রিপোর্টের অন্ত এই ভাবে :এই তরুণীটি কামুকী,কুটিলা,বদমেজাজী, স্বার্থপর এবং অনৈতিক রূপেও তার যথেষ্ট সুনাম। কোন কিছু নিজের করে পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে এমন কোন দুঃসহ কাজ ছিল না যা সে করতে পারে না। ইরার মূল অস্ত্র ছিল ইরার সাহসিকতা, বুদ্ধিদীপ্তা, চতুরা, বিচক্ষণা, দৃঢ়সংকল্পশালিনী, সর্বোপরি সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারিণী। শুধু তাই নয় লেখাপড়া, বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিং মেশিন ও কম্পিউটারে সে তার পারদর্শীতা বজায় রেখেছিল।

এডরিস যা আশা করেছিল এই মেয়েটি তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিভাশালী। তাই সে সময় নষ্ট না করে জাল বিছানোর কাজে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। ইরাকে দেখে তার সুপ্ত বাসনা আরো দৃঢ় হল–একে দিয়েই তার কাজ হবে। তবে নিজের মতো করে ঘষে মেজে নিতে হবে এই যা।

এডরিস বলল, বুঝলে তো? আমি তোমার সম্পর্কে না জেনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। এবার বলো, তুমি কি কিছু টাকা উপার্জন করতে চাও?

ইরা একটু ভেবে নিয়ে বলল:এতো সকলেরই কল্পিত ইচ্ছা, তবে আমার চাওয়া দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে : কত পাব আর তার জন্য আমায় কী বলিদান দিতে হবে?

এডরিস আড়চোখে ইরাকে একবার দেখে নিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল :বেবী তুমি কখনো স্বপ্ন দেখেছ?

–বহুবার।

—কত টাকা পাবার আশা তুমি কর?

–পাবার আশা অনেক।

–তবু? তোমার কল্পনার পরিমাণ কত?

ইরা থতমত খেয়ে গেল। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, যদি বলি এক লক্ষ ডলার।

-ব্যস! হো হো করে বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল এডরিস। হাসতে হাসতেই বলল, তোমার কল্পনার দৌড় এই পর্যন্ত? এত অল্পে সন্তুষ্ট তুমি। দশ-বিশ পর্যন্ত ওঠার ক্ষমতায় কুলোল না? নিছক স্বপ্ন তো!

ইরা বিরক্তিসূচক মুখ নিয়ে রিস্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, বাজে কথা এবার থামাও, অনেক হয়েছে। গাড়ি ঘোরাও। বাড়ি যেতে হবে আমায়, হাতে কাজও কিছু আছে।

বাড়ি ফেরার এতো তাড়া কিসের, বাড়ি ফিরবে তো নিশ্চয়ই। আগে আমার কথা শেষ করতে দাও তারপর না হয় তোমার মতামত দিওবাজে না কাজের তা শুনলেই বুঝতে পারবে, কোমল কণ্ঠে জবাব দিল এডরিস।

একটু থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল : আমি যদি বলি তোমার প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার ডলার, তবে কী কোন বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস তোমার আছে?

ইরাও পাল্টা দৃষ্টিতে তার প্রতিপক্ষকে একবার নিরীক্ষণ করল। বোঝবার চেষ্টা করল সে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে নাকি।

কিন্তু এডরিসের মুখভাব, তার চাউনিতে তামাসার কোন ইঙ্গিত ছিল না বরং তার পরিবর্তে সিরিয়াস হবার ভাব-ভঙ্গিমাই ছিল প্রকট। সহসা সে রক্তের মধ্যে এক অনাস্বাদিত পূর্ব চাঞ্চল্য অনুভব করল। নিজেকে অতিকষ্টে সংযত করে ধীরেসুস্থে প্রশ্ন করল : কোন বিষয়ে আমার ঝুঁকি নিতে হবে। যেমন আমি আমার স্বাধীনতার ঝুঁকি নিজের কবলে নিয়ে নিয়েছি। (

বল কি। তোমার স্বাধীনতার ঝুঁকির মূল্য পঞ্চাশ হাজার ডলার? তুমি সত্যি হাসালে। শুধু স্বাধীনতা কেন? তুমি তোমার যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে সব কিছুরই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছ ঐ টাকার জন্য আর কিছু?

শোন,টাকাটা কিন্তু আমি নিজে হাতে তোমার হাতে তুলে দেব না। তোমার বুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে সেই টাকা উপার্জন করতে হবে।

–কেমন করে?

পরে আসছি এই কথায়। তার আগে আমার এই প্ল্যানের প্রকৃত ইতিহাস কি তা জেনে নাও।

এই বলে এডরিস তার বয়ান শুরু করল।মুরিয়েলের ব্যাপারে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে বিবাহ করা, আবার স্বামীর ঘর ছেড়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা পর্যন্ত যাবতীয় যা কিছু আছে তা একটু একটু করে ইরার সামনে তুলে ধরল। গভীর মনযোগে ইরা এডরিসের কথাগুলো শুনে যেতে লাগল।

অতঃপর এডরিস ইরাকে তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলল:তার প্ল্যানেইরার অবস্থান কোথায়, কী তার অংশ ইত্যাদি সব বিস্তৃত ভাবে বলল, মুরিয়েলের স্বামী আর কখনো তার মেয়েকে দেখেননি, ষোল বছর ধরে মেয়ের কোন সংবাদ রাখেননি। তোমার চেহারা অবিকল মুরিয়েলের মতন। মিঃ ডেভন যদি তোমায় একবার দেখেন তবে ভাববেন–মুরিয়েলই বোধহয় কোন যাদুমন্ত্র বলে আবার তার কিশোরী বয়সে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাই এদিক থেকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তোমায় তিনি তার নিজের কন্যা রূপে গ্রহণ করবেন নির্দ্বিধায়।

কথাটাতে যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়নি ইরা তা জানত। কেন না কথায় কথা উঠলে তার মা-ই কতবার বলেছে : তুই আমার হারিয়ে যাওয়া মেয়ে মুরিয়েল। তার জায়গা দখল করেছিস তুই, ইরা। অবিকল মুরিয়েল হয়েছিস তুই।

এডরিস তার বক্তব্য শেষ করলে ইরা বলল, তানা হয় হল, কিন্তু আমি যার পরিবর্তে ডেভনের মেয়ে সেজে যাব তার ব্যবস্থা কী হবে? সে যদি কোনভাবে এই সত্য জানতে পেরে যায়।

না, সে জানতে পারবে না। জানবেই কী করে? গত সপ্তাহ তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই তো আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে। সে জীবিত থাকলে কি আর আমার এই প্ল্যান বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ দেবার সাহস করতাম আমি? সে মারা যেতেই তো এই মতলবটা আমার মাথায় খেলে গেল। অবশ্য তোমার দিদি গত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে, মনে হয় বড় জোর তিন থেকে চার মাস। তার যা অবস্থা, ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে কিনা সন্দেহ। হেরোয়িনের বিষ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেছে।

ইরা আবার প্রশ্ন করল : দিদির মেয়েটা মরল কী সে?

জলে ডুবে। অম্লান বদনে মিথ্যে বলে গেল এডরিস। সাঁতার কাটতে নেমেছিল সমুদ্রবক্ষে, হাতে পায়ে খিল ধরে হঠাৎ, সাহায্যের জন্য কেউ ছুটে আসার আগেই সে অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।

আর কিছু বলল না ইরা। তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে এডরিস জিজ্ঞাসা করল :শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলে? কাজটা করবে কি করবে না? ঝুঁকি আছে নিঃসন্দেহে আর টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ হাজার ডলারও তো কিছু কম নয়।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইরা বলল, আমায় কয়েকটা দিন ভাবার অবকাশ দাও টিকি। তুমি বরং আগামী রবিবার এখানে একবার পদধূলি দিও। সেই দিনই আমি আমার মতামত জানিয়ে দেব তোমায়।

–অসম্ভব! পরের চাকরি করে আমায় বেঁচে থাকতে হয়। ঘন ঘন এত দূরে আসা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আজ এসেছিছুটি ভাগ্যে জুটেছে বলে। এক কাজ কর, এই

বলে পকেট থেকে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড বের করে ইরার হাতে তুলে দিয়ে বলল, তোমার মন আর মতি স্থির হলেই এখানে আমায় টেলিগ্রাম করে দিও–হ্যাঁ বা না এই দুই শব্দের মধ্যে তোমার মর্জি মতো যে কোন একটা বেছে নিয়ে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, তোমার দিদি মৃত্যুর কোলে মাথা না রাখা পর্যন্ত একাজে আমরা হাত দিতে পারব না, তাই ব্যস্ততার কোন কারণ নেই। ঠিকঠিক ভাবে কাজ হাসিল করতে হলে হাতে সময়ের প্রয়োজন। আমি আমার কাজ সঠিক পথেই করতে চাই। বুঝলে?

এয়ারপোর্টের রিসেপশান লবীর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই সব কথাই চিন্তা করছিল ইরা। এরপর বার দুয়েক মুখোমুখিও হয়েছে টিকির সঙ্গে। প্ল্যান আর প্রোগ্রাম এই দুটি বহুবার ঘষে মেজে পরিষ্কার করেছে সে। সব শোনার পর ইরার মনে হয়েছে–প্ল্যান নিখুঁত ও নির্ভুল। সাফল্য এই পথে আসতে বাধ্য। মা বাবাকে ছেড়ে আসতে মনে যতব্যথা অনুভব করেছিল তার থেকে অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছিল শুধু ফারকে ছেড়ে আসতে। তাকে কোন কথা ইরা জানায়নি। শুধু বলেছে : ব্রুকলিনের বাইরে ভালো একটা চাকরী তার ভাগ্যে জুটেছে, আপাততঃ এখন সে সেখানেই থাকবে।

৩-৪. নোরেনা চুপচাপ

০৩.

নোরেনা চুপচাপ সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে বসেছিল। মায়ের কথাই সে চিন্তা করছিল। কথা বললেই বিরক্ত প্রকাশ করছেন বলে মিঃ টেরলকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না। তার তন্ময়তা তখনই দূর হলো যখন সে দেখল পথ ছেড়ে বুইককে বিপথে নামতে দেখে। তাকে বিস্মিত করে ফিল ওরফে মিঃ টেরলকে যেন রোড থেকে সরু আর ধুলোভরা এক রাস্তায় প্রবেশ করতে দেখে সে চিৎকার করে উঠল। একি কী করছেন আপনি। এটাতো প্যারাডাইস সিটিতে যাবার পথ নয়।

চিন্তার কিছু নেই, ঠিক আছে।গম্ভীর মুখে মন্তব্য করে গাড়ির গতিবেগ আরো প্রবলভাবে বাড়িয়ে দিল ফিল।

–না, ঠিক একেবারেই নেই, এ পথ আমার চেনা-সোজা নাক বরাবর চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। আপনি ভুল পথে চালিত হচ্ছেন, মিঃ টেরল। তীক্ষ্ণ সুরে তাকে সাবধান করতে চাইল নোরেনা।

–সমুদ্র রয়েছে তো কী হয়েছে? সমুদ্র দেখতে তোমার কী ভালোলাগে না?

এ পথের আগাগোড়াই ফিলের নখদর্পণে। গত হপ্তায় হাইওয়ে নাম্বার ৪এ, ধরে সে বারংবার যাওয়া-আসা করেছে আর সন্ধানের অপেক্ষায় আছে একটি খুনের আদর্শ জায়গা। নির্বিকার চিত্তে নোরেনাকে হত্যা করে তার লাশটা সহজেই সরিয়ে ফেলতে

পারবে। অনেক খোঁজাখুঁজি আর বিচার-বিবেচনার পর এখন যে পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে নোরেনাকে সঙ্গে রেখে, সেটাই একমাত্র উপযুক্ত আর আদর্শ স্থান বলে মনে হয়েছে ফিলের।

গত সপ্তাহের শেষ কদিন দিনে রাতের বিভিন্ন সময়ে এখানে হাজির হয়েছে কোন সময়ের জন্যই জনমানবের সে সম্মুখীন হয়নি। না পথে, না সমুদ্রের ধারে। শুধু লক্ষ্য করেছে, সপ্তাহের শেষ দুটো দিন শনিবার আর রবিবার কেউ কেউ সমুদ্রস্নান বা আমোদ আহ্লাদের উদ্দেশ্যেও এখানে আসে।

ফিলের এই প্রশ্নের জবাবের উত্তরে নোরেনা জবাব দিল,সেকথায়, মিঃ টেরল সমুদ্র দেখতে আমিও ভালোবাসি। সমুদ্রের চেয়ে অনেক বেশী জরুরী আমার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি ঘটে ততই মঙ্গল। কারণ আপনিই এই মাত্র বলেছেন আমার মার মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, মিঃ টেরল হাইওয়ে ধরুন।

–তুমি কী করে জানলে যে এ পথ ধরে গেলে তুমি তার কাছে পৌঁছতে পারবে না? আমি কী একবারও বলেছি যে তোমার মাতৃদেবী প্যারাডাইস সিটিতে আছে? শুধু বলেছি–তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?

–প্যারাডাইস সিটিতে আমার মা নেই? তাহলে কোথায় আছেন?

-তোমার মাকে কালভার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই রাস্তাটা ধরে এগোলে। কালভার অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছন যাবে। মিথ্যে বলল ফিল।

মোটেই না, দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল নোরেনা, এ রাস্তা আমার পরিচিত। এপথ গিয়ে পড়েছে সমুদ্রের বালিয়াড়ির ধারে। স্কুলে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে দুতিনবার এখানে পিকনিক করতে এসেছি আমি।

ফিলের রাগে মাথা সপ্তমে চড়ে গেল। সে চোখ লাল করে কর্কশস্বরে বলল, বাজে কথা না বলে চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাক। এ রাস্তা কোথায় গেছে তা আমার অজানা নয়। মায়ের কাছে তোমার পৌঁছে যাওয়া নিয়ে কথা।

ভীতসন্ত্রস্ত বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে ফিলের দিকে তাকিয়ে রইল নোরেনা।ডঃ গ্রাহামের অফিসে যে লোকটিকে কিছুক্ষণ আগে সে দেখেছিল, এই কি সেই লোক? তাকে দেখে ভদ্র, চমৎকার আর বিনয়ের অবতার বলেই মনে হয়েছিল। আর এ?

শীতল হিমস্রোত কুল কুল করে প্রবাহিত হয়ে গেল নেরেনার শিরদাঁড়া বেয়ে। সেকুলকিনারা করতে পাচ্ছিল না, যে–একজন মানুষ এতো তাড়াতাড়ি নিজেকে এমন সুন্দর ভাবে বদলে ফেলল কি উপায়ে? একটু পরেই সমুদ্র দেখা চোখের সামনে।

শতখানেক গজ এগিয়ে গিয়ে এপথ শেষ হয়ে আবার ইউ-য়ের আকারে মোড় নিয়েছিল। নোরেনা আবার তাকাল ফিলের দিকে। মুখের ভাব নরমের পরিবর্তে এখন কঠিন। ঘামে ভিজে সারা মুখ চক্করছে। চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি জুড়ে বিরাজমান ভয়ঙ্কর জ্বালাময় দ্যুতি। নোরেনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সাবধান হতে নির্দেশ করল বারবার।

খবরের কাগজে সে বহু তরুণী রমনীর চরম সর্বনাশের কাহিনী পড়েছে। নেরেনা বার বার এই ভেবেছে যে মেয়েরা নিজেদের দোষেই এভাবে ধর্ষিতা আর নিহত হয়েছিলকামুক নরপশুদের হাতে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অভদ্র আর অশালীন আচার আচরণে লুব্ধ হয়ে ওঠে সেই কামুক নরপশুর দল আক্রমণ হেনেছে মেয়েগুলোর ওপর। তাদেরনারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে নিজেদের বাঁচার অগিদে। কিন্তু এ লোকটি অযথা তাকে কেন আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়? কী অশালীনতা, কী অভব্যতা সে প্রকাশ করেছে এর কাছে? তার কোন অসভ্য আচরণের স্কুল ইঙ্গিতে এই পুরুষের প্রথম রিপুটি জেগে উঠেছে? এতো একজন শিক্ষিত, সুবেশধারী, সুদর্শন পুরুষ–তার মায়ের অ্যাটনী। কোন কামোন্মাদ নরঘাতক নয়। কিন্তু এ লোকটি সত্যিই তার মায়ের অ্যাটনীতে? কৈ, মাতো কোনদিনই তার কাছে এর বিষয়ে গল্পচ্ছলেও বহির্ভকাশ করেনি। নোরেনা আবার অগ্নিদগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ফিলের দিকে। ফিল ততক্ষণে তার গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে।

নোরেনা এরকম পরিস্থিতিতে যে কী করবে তা সে ভেবে পেল না। তার মনে ততক্ষণে এই বিশ্বাস দানা বেঁধেছে যে, মায়ের অ্যাক্সিডেন্টের কথা সর্বৈব মিথ্যা। লোকটি এক মস্ত প্রবঞ্চক। প্রবঞ্চনার মাধ্যমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে বাইরে বের করে এনেছে কোন কু-মতলব সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

ফিল গাড়ির ইগনিশান-কীট সবেমাত্র পকেটে পুরতে যাবে, ঠিক সেই সময় পাশের দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপ দিল নোরেনা। তারপর দে ছুট।

এইরকম পরিস্থিতি যে ফিলের সম্মুখীন হতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই ঝাঁপ দিতে তার কয়েক মুহূর্ত দেরী হল।

নোরেনা ছুটে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ায় সে যে পথ দিয়ে এসেছিল বুইক চেপে, সে পথে না গিয়ে সমুদ্রের সমান্তরাল বালিয়াড়ি ভেঙে ছুটল।

শুধু শুধু হকি আর বাস্কেটবল খেলেনি সে স্কুল কলেজে অনর্থক ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্ট একশ গজের ফ্ল্যাট রেসে বারংবার বিজয়িনী হয়নি...বিশ্রী হাই জাম্পে গোটাকয়েক মেডেল পায়নি স্পোর্টসে। এতোদিনে এটা তার কাজে এল, এবার সে নেমেছে জীবন দৌড়ে। সে কী সফল হবে, পারবে নাকি বাজিমাৎ করতে? ফিলও প্রাণপনে তাড়া করে ছুটছে তার শিকারকে। মেয়েটাকে কোন ভাবেই হাতছাড়া করা চলবে না। মেয়েটা না হলে সমস্ত প্ল্যান একেবারে রসাতলে যাবে তাদের। তার ওপর ধরা পড়লে জেলের ঘানি টানতে হবে। কিন্তু ব্যবধান দুজনের মধ্যে বেড়েই চলল। ফিলের বুকে হাঁফ ধরল...পা ভারাক্রান্ত হয়ে এল। গতিবেগ আপনা থেকেই কম হয়ে গেল। নোরেনা ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছিল ফিলের দূর দৃষ্টিতে। এক সময় তার চোখে পড়ল, সমুদ্রের দিকে পেছন করে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে মেয়েটি। তার লক্ষ্য–ওক, উইলো আর ম্যাপেল গাছে ভরা এক জতুলে জায়গা।

ফিল আর না ছুটে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে জানত–ঐ জঙ্গুলে জায়গায় একটা পায়ে চলা পথ আছে, সেটা ঘুরতে ঘুরতে আবার ঐ পথে এসে মিশেছে–যে পথ ধরে বুইকে হাই হাই করে ছুটে এসেছে তারা। চট করে তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল।

মেয়েটাকে একসময় না একসময় এই পথেই ফিরে আসতে হবে ঘুরে ঘুরে। তখন তার হাত এড়িয়ে তার পালানোর কোন রাস্তাই খোলা থাকবে না।

নোরেনার অপেক্ষায় একটা গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে বসে থাকার সময় নানা চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিশেষ করে ইরা মার্শের কথা। মেয়েটির প্রশংসায় টিকি একেবারে পঞ্চমুখ। তাদের প্ল্যানের শতকরা নব্বই ভাগ সাফল্যই নির্ভর করছে এই মেয়েটির কর্মশক্তি, বুদ্ধিশক্তি আর স্নায়ুশক্তির ওপরেই। ও যদি সফল হয় তবে তারাও সফলতা পাবে। আর ও যদি ডোবে তাহলে তাদের ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। তার ওপর নির্ভর করছে সাফল্যের চাবিকাঠি অর্থাৎ শতকরা দশভাগ। ফিলের চালে যদি কোন ভুল হয় তবে জনি উইলিয়ামস, মুরিয়েলমার্শ আর নোরেনা মেয়েটার হত্যাকাণ্ড নিছকই হত্যাকাণ্ডরূপে সামনে ধরা দেবে।

তাদের প্ল্যান মাঠে মারা যাবে। তারই ভুল হয়েছিল টিকির প্রস্তাবে রাজী হওয়া। সে তার। পরিচিত সম্বন্ধে খুবই সচেতন যে সে একজন প্রতারক এবং প্রবঞ্চকও বটে। লোকের সঙ্গে প্রতারণা করাই তার মূল জীবিকা। আজ টিকির ফাঁদে পড়ে তাকে খুনী সাজতে হচ্ছে। আরও একটা ব্যাপারে সে টিকিকে ঠিক মনে-প্রাণে সমর্থন করতে পারছে না। ইরা মেয়েটাকে দশ হাজার ডলারের লোভ দেখালেই যেখানে কাজ চলে যেত, সেখানে পঞ্চাশ হাজার দেবার কোন যুক্তি আছে কি? টিকিকে কথাটা বলায় সে সাপের হাসি হেসে বলেছিল : আরে দেব বলেছি বলেই যে দিতে হবে তার কী মানে আছে? যেখানে তিন তিনটে খুন হওয়ার কথা, সেখানে খুনের সংখ্যা আরও একটা বেড়ে চারকে ছুঁয়ে যাবে, কী আসে যায় তাতে?

নাঃ টিকিকে সত্যি খুব নজরে রাখতে হবে। কে জানে সেও হয়তো আমারই মতো একই ভাবনা ভাবছে হয়তো : চারের জায়গায় ফিলকেও সরিয়ে দিয়ে সংখ্যাটা পাঁচে দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কি? ভাবতে ভাবতে এক অস্থিরতা তার মনকে আরো বিচলিত করে তুলল।

ঠিক সেই সময়ে অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। নোরেনা অসতর্ক ভঙ্গিতে বনের পথ ধরে তার সামনে এসে স্ব-শরীরে উপস্থিত হল–মাত্র কয়েক গজ তফাতে।

ফিলকে দেখামাত্র আতঙ্কে নোরেনার মুখ একপলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অজানা এক আগন্তুক নিমেষের মধ্যে তার শরীরের সমস্ত রক্ত আর শক্তি এক লহমায় শুষে নিল চো চো করে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল নোরেনা। ফিল বাঘের মতো অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় উঠে দাঁড়াল ফিল। নোরেনা নিজের মহামূল্যবান প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে গেল তার আততায়ীর সঙ্গে। কিন্তু শেষরক্ষা তার হলনা। শক্তিহীন, অবসন্ন, বিপর্যস্ত ফিল নোরেনার মৃতদেহের পাশেই দুহাতের তেলোয় মাথাটা টিপে ধরে চুপচাপ বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তার পরিচয় আজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেল সমগ্র পৃথিবীর কাছে। এতোদিন ধরে তার পরিচয় ছিল প্রবঞ্চক রূপে। কিন্তু আজ সে খুনী, নিরীহ, নিরপরাধ একটি মেয়ের হত্যাকারী। বহুক্ষণ বাদে সে তার অবনত মাথা তুলল। ঘড়ি দেখল সকাল আটটা চলিশ। হাতে এখন অনেক কাজ। লাশ পাচার করতে হবে, টুকিটাকি প্রমাণ ইত্যাদি যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিক-

ওদিকে, তা লোপ করতে হবে...টিকিকেও ফোন করে এই দুর্ঘটনার কথা জানাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই বসে এভাবে সময় নষ্ট করলেই চলবেনা। উঠে দাঁড়াল ফিল। ফিরে গেল বুইকের কাছে। ট্রাঙ্ক খুলে একটা বেলচাও বের করে ফেলল। বেলচা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল মৃতা নোরেনার নাগালের কছে। তার মরদেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পূর্বে সেই সুন্দর চেহারা বর্তমানে বীভৎস আর ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখার মতো ফিলের বুকের পাটা নেই। তাই সে একরকম চোখ বন্ধ করেই লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলল একটা বড় আর উঁচু বালিয়াড়ির দিকে। বালির তলায় পুঁতে ফেলতে হবে লাশটা।ফিলের মনোগত ইচ্ছা ছিল নোরেনার জামাকাপড়গুলো একটা পুঁটলিতে পাথরে বেঁধে সমুদ্র বক্ষে বিসর্জন দিতে কিন্তু এডরিসের কড়া হুকুমের বিপক্ষে যাওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। তাই হুকুম ছিল : নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। যদি কোনভাবে পুলিশের হাতে পড়ে তবে ওরা কলেজ-লীর ছাপ লক্ষ্য করে ঠিক তাদের জালে কোনভাবে ফাঁসিয়ে ধরে ফেলবে। সো উই কান্ট টেক এ চান্স।

তরুণী নোরেনাকে পোশাকমুক্ত করার সময় ফিলের দৃষ্টি গেল তার নধর-নিটোল তারুণ্যের ওপর। হাতকে স্পর্শও করল লোভনীয় ও আকাঙ্খিত কয়েকটি নারী অঙ্গ। অন্য সময় হলে তার যে পৌষত্ব জেগে উঠত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এতোই বেদনাদায়ক যে মৃত শরীরের পরশ লাগা মাত্রই সে অজানা এক আতঙ্কে শিউরে উঠছে। নোরেনার গলায় সোনার ক্রশ ঝোলানো সরু সোনার হার ঝুলছিল, সযত্নে খুলে সে পকেটে ভরল। জামা কাপড়গুলো বান্ডিল করে বেঁধে নিল।

তারপর নোরেনার নগ্ন মৃতদেহটা বালির ওপর শুইয়ে বালিয়াড়ির গায়ে বেলচার ঘা দিয়ে আঘাত হানতে হানতে বালির মধ্যে তাকে কবর দিয়ে ফেলল।

.

সকাল তখন নটা পঁয়তাল্লিশ।

পুলিশ প্রধান মিঃ টেরলের অফিসঘরে কথোপকথন হয়ে চলছিল তার এবং হেরে মধ্যে। বেইগলারনীরবে বসে কথাবার্তা শুনছিলেন ঘরের এককোণে। হেস বলছিলেন : আমাদের হাতে যা কিছু প্রমাণ আছে তা ঘুরে ফিরে একটা দিকই নির্দেশ করছে, চীফ। মুরিয়েল মার্শ প্রথমে জনিকে হত্যা করে তারপর লো-কোকাইল রেস্তোরাঁয় এসে নিজেও মৃত্যু বরণ করেছে। রিভলবার আর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের গায়ে মুরিয়েলেরই ফিঙ্গার ফ্রিন্ট পাওয়া গেছে। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে আমরা এমন আর কোন প্রমাণ পাইনি যাতে করে প্রমাণ করা যায় যে, সে জনিকে হত্যা করেনি অথবা নিজে বলি হয়েছে অপর কোন অজ্ঞাত আগন্তুকের হাতে।

-সুইসাইড নোটের হাতের লেখা রিপোর্ট কী বলছে?

–ওটা মুরিয়েলেরই হস্তাক্ষর। ওর অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে অন্য যে সব নমুনা পেয়েছি–এক্সপার্টরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই রায় দিয়েছেন প্রত্যেকটা নমুনাই একজনের হস্তাক্ষর ইঙ্গিত করছে।

–হুম বুঝলাম।

আমার মনে হয় চীফ উই ক্যান্ ক্লোজ দ্য ফাইল, আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

মিঃ টেরল হেসের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পরিবর্তে পাল্টা প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে হেকে বললেন, ওর স্বামীর কোন সংবাদ আছে? সন্ধান করতে পেরেছ তার? এনকোয়ারীর জন্যে তাকে তো একবার প্রয়োজন হবেই। তাছাড়া কন্যাসন্তানও বর্তমান।

তারপর নিজেই নিজের গাল চুলকোতে চুলকোতে বেইগলারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, জো এতক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্তা চুপচাপ থেকে শুনে যাচ্ছিলেন।

জো! টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুঁজে ফেল। ডেভন নামে কাউকে পাও কি একবার দেখতে।

বেইগলার চেয়ার ছেড়ে উঠেদাঁড়িয়ে সেই কামরার এককোণে বুক-সেল থেকে টেলিফোন ডাইরেক্টরী নামিয়ে এনে ঝুঁকে পড়ে পাতা উল্টাতে শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে জানালেন পেয়েছি চী, মেলভিন ডেভন, একশো পঞ্চান্ন হিলসাইড ক্রিসেন্ট। ফোন করবে?

কর।

বেইগলার লাইন জুড়লেন টেলিফোনের রিসিভার তুলে। সামান্য পরেই ওপাশ থেকে সাড়া এল এক মহিলার : দিস ইজ মিঃ ডেভন রেসিডেন্স।

-সিটি পুলিশ, বেইগলার জবাব দিলেন, মিঃ ডেভনকে কলটা একবার দেবেন কি?

-তিনি এসময়ে বাড়ি থাকেন না। আপনি ওঁর ব্যাঙ্কে ফোন করে দেখতে পারেন।

কোন ব্যাঙ্ক?

–ফ্লোরিডা সেফডিপোজিট ব্যাঙ্ক, নম্বর চান?

–নম্বর আমার জানা, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবেনা, ধন্যবাদ।রিসিভার নামিয়ে রেখে বেইগলার তার চীফকে বললেন, ভদ্রলোক ফ্লোরিডা সেফ ডিপোজিট ব্যাঙ্কে কাজ করেন স্যার।

শুনে টেরলের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি একটু চিন্তিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, লোকটি আমার। পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। গলফ খেলায় তার যথেষ্ট সুনাম।কন্ট্রি ক্লাবে দুজনে বেশ কয়েকবার এক সঙ্গে গলফ খেলেছি। চমৎকার মানুষ। যদি সেই ভদ্রলোক হন তবে একটু সমস্যা সৃষ্টি হবে, তোমাদের প্যারাডাইসকাগজেরবার্ট হ্যাঁমিলটনএসংবাদ তার কানে পৌঁছলে পাতাভর্তি ফীচার লিখতে বসে যাবেসঙ্গে সঙ্গে। হেডিং দেবেহয়তোফ্লোরিডা সেফডিপোজিট ব্যাঙ্কের একজন কর্তা ব্যক্তির স্ত্রী হত্যা এবং আত্মহত্যার কাণ্ডে জড়িত! ভাবতে পার কথাটা? ওঁর সঙ্গে কথোপকথনের ব্যাপারটা তুমি বরং আমার ওপরেই ছেড়ে দাও, জো। তুমি অন্য কাজে হাত দাও বরং।

মিঃ মেলভিন ডেভন একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। বাদামী চুলে ধূসরতার ছায়া স্পষ্ট।

সমুদ্রের মতনীল চোখের তারা, শান্তদৃষ্টিতবেমর্মভেদী। মুখশ্রী যেমন সুন্দর তেমনি হাসি খুশি। তাকে দেখলে বোঝা যায় ভদ্রলোক কর্মী,দয়ালু, বিবেচক কিন্তু মনের দিক থেকে সরলতার পরিবর্তে জটিল মনোভাবই প্রকট।

বহুদিন পরে মিঃ টেরলকে দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনে খুবই খুশী হলেন। তাকে সমাদরে বসিয়ে কুশলাদি বিনিময়ের পরে বলে উঠলেন, কতদিন পরে দেখা!

আপনি তো ক্লাবে যাওয়া একপ্রকার ভুলেই বসেছে, মিঃ টেরল। গলফ খেলা ছেড়ে দিলেন নাকি?

-না, একেবারে ছেড়ে বললে একটু ভুল বলা হবে। মাঝে মধ্যে ক্লাবেও ঝাঁকি দর্শন দিই। কাজের চাপে কোনটাই ঠিক নিয়ম মাফিক হয় না, এই আর কি।হাসি হাসি মুখে উত্তর দিলেন টেরল।

কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথালাপ সারতে লাগলেন দুই বন্ধুতে। বুদ্ধিমান টেরলের বুঝতে অসুবিধা হলনা যে, যদিও মেল ডেভন তার সঙ্গে আন্তরিক ভদ্রতার এবং হৃদ্যতার বশবর্তী হয়েই আলাপকরছেন, তবু তিনি যেকর্মব্যস্ত এবং এই সময়টুকু তার অফিসের কর্তব্য আর কর্মভাণ্ডারকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলে তার মনের মনি কোঠায় যে সাময়িক অন্যমনস্কতার গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে, তা তার চোখের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না। তাই ভূমিকার আড়াল না নিয়ে টেরল মূল বক্তব্যে এসে পড়লেন। বললেন, মিঃ ডেভন! আমি একজন মহিলার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার

অভিপ্রায় নিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন, বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। ভদ্রমহিলার নাম মুরিয়েল মার্শ ডেভন।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য ডেভন মানসিক দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর শক্ত কাঠ হয়ে গেলেন ডেভন। চোয়াল আপনা থেকেই কঠিন আকার ধারণ করল। শান্ত দৃষ্টি হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ আর সন্দেহপ্রবণ। তবে এই ভাবান্তরের রূপের প্রকাশ ছিল সাময়িক। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন : আমার স্ত্রীর নাম, কিন্তু কী ব্যাপার? সে কোনরকম ট্রাবলে পড়েছে নাকি?

জবাব শুনে ভেতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন টেরল, যাক নোরেনার পিতার সন্ধানও অবশেষে মিলল, মনোভাব গোপন রেখে টেরল এবার কথালাপের মধ্যে কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নিলেন। গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, হ্যাঁ, একরকম ট্রাবলই বটে। গতরাত্রে উনি মারা গেছেন..সুইসাইড করেছেন।

শুনে ডেভন অনড় হয়ে বসে রইলেন নিজের চেয়ারে। কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন টেরলের দিকে তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বছর পনেরো-ষোল হবে আমাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমরা যখন বিবাহ করি তখন দুজনেরই বয়স ছিল খুবই কম–মাত্র উনিশ কি কুড়ি দুইছই। বছর দুই মতো আমরা একসঙ্গে সুখী গৃহকোণে বসবাস করেছিলাম। আমাদের একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যা সন্তান হয়েছিল। তাকে সঙ্গে নিয়েই সে ঘর ছাড়ে। অভিমানে পাথর হয়ে আমি তার বিপক্ষে গিয়ে তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিনি। এতদিন পরে, আপনার কাছে এই প্রথম তার নাম

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

শুনলাম, যখন সে মৃত, আত্মহত্যা করেছে শুনে মনে ব্যথা পেলাম। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহিলা মুরিয়েল? অন্য কেউ নয়?

একটি মেয়েও আছে, তার নাম নোরেনা।

–তবে সে মুরিয়েলই। কারণ মেয়ের নামকরণ আমি করেছিলাম। নোরেনার কোন সংবাদ জানেন?

মিঃ ডেভনের সঙ্গে দেখা করতে আসার কিছু আগে এডরিসের ফোন এসেছিল মিঃ টেরলের কাছে। তাতে সে জানিছিল:মুরিয়েলের হিতাকাঙকী একজন বন্ধু হিসেবেই সেমুরিয়েলের মৃত্যু সংবাদটা তার মেয়ে নোরেনাকে না জানিয়ে পারেনি। নোরেনা সংবাদ পেয়ে এখানে খুব শীঘ্রই আসছে। কিন্তু সে এসে কোথায়, কার কাছেই বা থাকবে? তারওপর তার ভরণ পোষণের প্রশ্নও আছে। এডরিস হয়তো কিছুদিন তার সব দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু তারপর? সেই জন্যই টিকি টেরলকে অনুরোধ করেছে।

মিঃ টেরল যদি খুব তাড়াতাড়ি নোরেনার পিতার খোঁজ নিতে পারেন আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেই ভদ্রলোকের কাছে মেয়েটার একটা গতি করে দিতে পারেন, তাহলে মুরিয়েলের পারিবারিক বন্ধু হিসেবে খুব খুশী আর সুখের অন্ত থাকবে না তার। তারজন্য প্রয়োজনে যদি কিছু অর্থব্যয় করতেও হয় তাতেও এডরিস প্রস্তুত।

মিঃ টেরল জানিয়েছিলেন: নোরেনার পিতার সন্ধান তিনি অবিলম্বেই করছে, সেজন্য টিকির চিন্তার কোন কারণ নেই। নোরেনার পিতা ভেবে, এই মুহূর্তে যার খবরা-খবর নিতে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন, যদি তা সত্যি হয় তবে তিনি এডরিসকে এই উপদেশ

দেকেন–এডরিস যেন মুরিয়েল আরজনি উইলিয়ামএর কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে অযথা জল ঘোলানা করে তোলে। এর ফলস্বরূপ শুধু সেই ভদ্রলোকনয়, নোরেনার জীবনও অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে। এডরিস যদি সত্যি সত্যিই নিজেকে ওদের পরিবারের একজন বলে মনে করে থাকে, নোরেনাকে যদি সে সত্যিই স্নেহ করে, ভালোবাসে তবে যেন মুখে কুলুপ এঁটে থাকে আপাততঃ।

এডরিস এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল।

ডেভনযখন উদগ্রীব হয়ে নিজে থাকতেই নোরেনার সংবাদ জানতে ব্যাকুল হলেন তখন আরো একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিঃ টেরল। সানন্দে বলে উঠলেন, নোরেনার খবর ভাললাই, আজই তার স্ত্রীকোম্ব-এ মায়ের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছবার কথা, এই খবর আমরা তার মাধ্যমেই পেয়েছি।

বেচারি! এতো অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে না জানি কত কষ্টই না পাবে?

টেরল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন, যদি কিছু মনে করেন তবে পুলিশ অফিসার হিসেবে আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল আপনার কাছে। আপনি বিত্তবান, এ শহরের মাননীয় ব্যক্তি। তাই অধীনস্থ কাউকে না পাঠিয়ে তদন্তের কাজে আমি নিজে উপস্থিত হয়েছি–একজন বন্ধু হিসেবে।

–বেশ,করুন, কীপ্রশ্নকরবেন। আমার যতোটা জানা আছে অকপটে আপনাকে খুলে বলব।

টেরল একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে চলে যাবার পর তার পরবর্তী জীবনের কাহিনী সম্পর্কে আপনি যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন : না।

মিঃ টেরল সংক্ষিপ্তভাবেমুরিয়েল মার্শের কাহিনীতুলে ধরলেন ডেভনের সামনে। ধীরে ধীরে বলে চললেন তার মর্মান্তিক কাহিনীর অন্তিম দিনটি পর্যন্ত। মিঃ ডেভন স্তব্ধ মুখে পাথরের মতো উপবিষ্ট ছিলেন তার আসনে, দরকারী অদরকারী সকল প্রমাণ সমেত মার্শের জীবনী টেরল তার কাছে তুলে ধরলে ডেভন বললেন, আপনি বলছিলেন না যে, নোরেনা আজ সকালে ফিরছে প্যারাডাইস সিটিতে?

–হ্যাঁ, এডরিস তাই তো বলছিল আমাকে, তার ধারণা, আপনার কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তাকে দেখার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

মিঃ ডেভন বলে উঠলেন, এডরিসের ধারণাই ঠিক। তার মা আমার কাছে দোষী হতে পারে কিন্তু সে তো নয়। আচ্ছা মিঃ টেরল! নোরেনার সম্পর্কে আপনার আরো কিছু জানা আছে কি?

–যা জানতাম অর্থাৎ এডরিসের মুখ থেকে যা শুনেছি, তার সবটাই আপনার কাছে ব্যক্ত করেছি। বাড়তি হিসেবে তার একটা ছবি বরং আমি আপনাকে দিতে পারি। এই বলে মিঃ টেরল তার কোটের পকেট থেকে ইরা মার্শের একটি ছবি–এডরিস সুকৌশলে যেটা মুরিয়েলের ড্রেসিংটেবিলের ফটোস্ট্যান্ডে আটকে রেখেছিল আসল নোরেনার ছবির পরিবর্তে, সেটাই বার করে ডেভনের সম্মুখে বাড়িয়ে দিলেন, এই নিন।

মিঃ ডেভন সাগ্রহে ছবিটা নিয়ে অনেকক্ষণ বিস্মিতপুলকে দেখতে দেখতে এক সময়ে বললেন, অবিকল ওর রূপে ঠিক ওর মা। আমার সন্তান নোরেনা। আশ্চর্য! দীর্ঘ পনেরো বছর পরে ওর ছবি দেখছি। সত্যি ভাবতেই অবাক লাগছে যে, আমার সতেরো বছরের সুন্দরী একটি মেয়ে আছে। ওর মায়ের ফ্লাটেই উঠবে বোধহয়? এডরিসের ঠিকানাটা কী যেন মিঃ টেরল?

টেরল এডরিসের ফোন নাম্বার ও ঠিকানা দুই লিখে দিলেন ডেভনকে। আর বললেন, এডরিসকে টেলিফোন করে বলে দেবেন আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যেতে চান। তারপর না হয় যাবেন।

ডেভন শুধু হাসলেন। বললেন, আমার উদ্দেশ্য? সেতো জলের মতো পরিষ্কার। আমি আমার মেয়েকে তার নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে চাই।

.

এয়ারপোর্টের বাইরে বাসটার্মিনাসের কাছে একটা বেঞ্চের ওপর দুহাত কোলের কাছে জড়ো করে চুপচাপ বসেছিল ইরা।ফিল অ্যালগিরের হাঁকিয়ে আসা গাড়ি তার থেকে একটু তফাতে এসে থেমে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারল : এই মেয়েটি আসলে ইরা মার্শ, যার ফটো এডরিস তাকে দেখিয়েছিল। এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে একেই হাজির করাতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ফিল। তারপর ইরার সামনা-সামনি এসে গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করল: তুমিই কি ইরা মার্শ? ব্রুকলিন থেকে রাতের ফ্লাইট ধরে এসেছ?

ইরাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। আশাকরি, তুমি ফিল অ্যালগির?

-হ্যাঁ।

–তা এত দেরী হলো কেন? মাল টেনে মত্ত হয়ে ফুর্তি করতে করতে ঘুমে অচৈতন্য ছিলে নাকি?

ফিলতো হতভম্ব। বাপরে! কী সাংঘাতিক মেয়ে, দেহের বয়সে সতেরো হলে হবে কি, কথা শুনলে মনে হয় মনের বয়সে বুঝি আরো দশ এগিয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড অতিবাহিত হল তার মুহূর্তের হতভম্ব ভাব কাটাতে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল; আমার কাজকর্মের কৈফিয়ৎ না চেয়ে চটপট করে গাড়িতে উঠে বস। এখন থেকে নিজের ওজন বুঝে কথা বলতে শেখ। নইলে বিপদে পড়বে কোনদিন।

ইরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল : উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।বুইকের ব্যাকসীটে উঠে বসল।

পাহাড়-প্রমাণ এক বোঝা, নিজের মনে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে ছটপট করছিল এডরিস। সাড়ে এগারোটা বেজে গেল অথচ ফিল বা ইরা কারো কোন দেখা নেই। কী ব্যাপার কে জানে? ভাবা শেষও হয়নি তার আগেই দরজার ঘন্টি বেজে উঠল। এডরিস

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দোর গোড়ায় ইরা আর ফিল পঁড়িয়ে। দুজনে একসঙ্গে ঘরের মধ্যে পা রাখল। ফিলের হাতের ব্যাগটা দেখিয়ে এডরিস জিজ্ঞাসা করল : ওতে কী নোরেনার পোশাক বুঝি?

-হ্যাঁ। জবাব দিল ফিল।

এডরিস তখন ইরাকে বলল, ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে ও ঘরে নিয়ে তোমার পোশাক তাড়াতাড়ি করে বদলে ফেল। মিঃ ডেভন আসছেন। হাতে কেশী সময়ও নেই। আর শোন, বুঝে শুনে ওর সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলল। কারণ মাথায় রেখ তোমার মার সব দুঃখ কষ্টের মূলে কিন্তু ঐ ডেভনই। আর মা ছিল তোমার প্রাণের চেয়েই প্রিয়। যা যা শিখিয়েছি সেইমতো নিখুঁতভাবে অভিনয় করো। ক্লীয়ার?

–ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত করে না বললেও চলবে। আমি নিরেট নই, বুদ্ধির জোর আমারও আছে। অভিনয়ের জন্যে যখন টাকাটা হাত পেতে নিচ্ছি তখন দক্ষতার সঙ্গেই অভিনয় করে যাব। এর জন্য অযথা চিন্তা ভাবনা করো না।

কথা শেষ হলে নিতম্ব দুলিয়ে ব্যাগ হাতে করে চলে গেল এডরিসের নির্দেশিত কামরার দিকে।

.

০৪.

বাহামায় তিন সপ্তাহ ধরে ছুটি উপভোগ করার পর তাই কিছুক্ষণ হবে বাড়ি ফিরেছে জয় অ্যানসলি। বাবাও গিয়েছিলেন তার এই ভ্রমণের পথে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, জয়ের মতন একজন রোমান্টিক প্রকৃতির মেয়ের পক্ষে বাহমার মতন একটি সুন্দর রোমান্টিক দ্বীপে কোন পুরুষের সঙ্গে না এসে আশী বছরের বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ভ্রমণের আনন্দটা সম্পূর্ণভাবেই মাটি হয়ে গেছিল। কিন্তু উপায় যখন অভাব তখন এই কঠোর মতকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বহু চেষ্টা করেও বাবার পরিবর্তে মেল ডেভনকে কিছুতেই রাজী করানো সম্ভব হল না।

জয় অ্যানসলির বয়স ত্রিশ বত্রিশ লম্বা তবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে তাকে বেশ মানিয়ে গেছে। এই বয়সেও মোহময়ী সুদৃঢ় যৌবনের অধিকারিনী সে। চরিত্র মাধুর্য আর চারিত্রিক দৃপ্ততায় সাধারণ ঘরের মেয়ের চাইতে অনেক ওপরেই ছিল এই জয়। বছর পাঁচেক আগের কথা, এক বান্ধবীর দেওয়া পার্টিতে মেল ডেভনের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ জয়ের। প্রথম দিন থেকেই সে মেলের প্রেমে পড়ে যায়। মেল যে বিবাহিত তবু পত্নীবিহীন এবং এই নিঃসঙ্গতা দূর করতে সে যে কাউকে আবার জীবন সঙ্গিনীরূপে বেছে নিতে তার বিশেষ কোন উৎসাহ নেই–তা অজানা ছিলনা জয়ের কাছেও। তবু দমবার পাত্রী সে নয়। জয়ের আশা ছিল, তার প্রেম যদি খাঁটি হয়, নিখাদ হয় তবে একদিন না একদিন মেল তার বাহুতে একান্তভাবেই জয়ের হয়ে নিজেকে সমর্পণ করবেই করবে। জয় চঞ্চল বা অস্থির প্রকৃতির মেয়ে নয়–সে প্রতীক্ষা করতে জানে। গত পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে সে তার প্রতীক্ষার দিন গুণছে। মেলের বান্ধবী আর সঙ্গিনী হিসেবেই জয় পরিতৃপ্ত। জয়ের বাবা একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। লোকচরিত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার ও যথেষ্ট। মেলকে তিনি সুনজরেই দেখেছেন।

বেডরুমে বসে বসে একমনে মেলের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে টুকিটাকি জিনিসগুলো গোছগাছ করছিল এই সময় ফোনটা বেজে উঠল।

–হ্যালো

–জয়, আমি মেল বলছি। ভাল আছ তো? তারপর ছুটি কাটালে কেমন?

–মন্দ নয়, ভালোই।

–জজ সাহেব ভালো আছেন?

—আছেন।

–জয়! আজ সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পার? কিছু জরুরী কথা ছিল।

মেলের কণ্ঠসরের এমন উদ্বেগ ছিল যা জয়ের কানকে ফাঁকি দিতে পারল না। সে মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল, নিশ্চয়ই হবে। কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে তুমি না হয় ঠিক করো?

–আমার দপ্তরেই চলে এসো।

–ব্যাঙ্কে! একটু অবাক হলো জয়। দীর্ঘদিনের অদর্শনের পরে বিরহের পালাকাতর যুবক-যুবতীর সাক্ষাৎকারের আদর্শ মিলনস্থল হিসেবে মেল কিনা পরিশেষে তার দপ্তরকেই বেছে নিল। তাই সে অনুরাগ ভরা সুরে বলল, এমন চমৎকার সন্ধ্যা কাটানোর জন্যে তুমি আর কোন জায়গা পেলে না, মেল? কেন সমুদ্রের ধারে তোমার যে বাংলোখানা আছে, সেখানে গেলে, মন্দ হয় না।

–না জয়, না তুমি আমার দপ্তরেই এসো। দেখা হবার পর আগাগোড়া একেক করে সব খুলে বলব তোমায়। ঠিক ছটার সময় তোমার দর্শন পাচ্ছি তো?

–ও, হ্যাঁ? জয়ের কণ্ঠস্বর সামান্য হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ ব্যাঙ্কে মেল ডেভনের রুমে টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে জয় আর মেল। ডেভন গম্ভীর মুখে কিছু বলছেন। আর জয় একমনে তা হজম করছে। তার চোখে মুখে নানান ভাবের খেলা। মুরিয়েল, জনি উইলিয়ামস, এডরিস আর নোরেনা, সবাইকে জড়িয়ে সমস্ত কাহিনীটাই কোথাও কোন অপূর্ণ না রেখে পুরোটাই শুনিয়ে গেলেন জয়কে।কাহিনীর অন্তহতেই অসহায়ের ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন, জয়! তোমার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব বহু পুরনো।

প্রকৃত বন্ধুর মতোই আমরা দুজনে দুজনের কাছে সহজ, সরল আর কোন বিষয়েই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়নি। অকপটেই উভয়ে উভয়ের কাছে সত্যতা স্বীকার করি। নোরেনার কথা আমি জানতাম না।মুরিয়েল ওকে নিয়ে ঘর ছাড়ার পর অভিমানে ওদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ নিইনি আমি, তবে নোরেনা আমার সন্তান। তারজন্য আমার অন্তরে

বরাব্বরই একটা স্নেহকোমল স্থান সুসজ্জিত রয়েছে। তাই মনটা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে হু হু করে উঠত তারজন্য। যতো সময় পেরোতে লাগল ততই অস্পষ্টরূপেরূপ নিতে থাকলতার ছবি। এতদিন বাদে আচমকা বিস্মৃতিরত ছেয়ে থাকা কুয়াশা সরিয়ে দেখা দিলসূর্যের আলো।সপ্তাহ দুইআগের কথা তুমি তখনবাহামায় উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে ছুটি কাটানোর জন্য, হঠাৎ করে ফিরে পেলাম আমার সন্তানকে। যখন তাকে হারাই তখন সে খুব ছোট মাত্র দুবছরের শিশু, আর আজ সে সপ্তদশী তরুণী।

হাব-ভাব, চালচলন..কথাবার্তাকত তফাৎ,কত পরিবর্তন।ও যদি অবিকল ওর মায়ের মতন দেখতে না হতো তবেও যে আমারই মেয়ে তা বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হতো। ওকে দোষী বানিয়ে লাভটাই বা কোথায়? পরিবেশ আর পরিস্থিতি ওকে আজ এইভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য করেছে। আমি ওকে কাছে পেয়ে লোভ সামলাতে পারলাম না। লোভীমন ওকে বুকে টেনে নিল। ওর মুখে একটু হাসি ফোঁটাতে, সুখে-সাচ্ছন্দ্যে রাখতে একজন আদর্শ পিতা রূপে যা যা করা প্রয়োজন–সবই করে গেলাম একেক করে। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও হার মানতে হল আমার বিরুদ্ধে ওর অশান্ত মনোভাবকে শান্ত করতে। ও বাবা বলে আমায় ডাকে বটে, শুনে মনে হয় যেন করুণা করে...মুখ বুজে কর্তব্য পালন করে।

জয় নোরেনার কথা শুনে মনে মনে আচমকা এক ধাক্কা খেল। মেলকে একান্তরূপে পাবার আশা সম্পূর্ণরূপে দুরাশার পরিণতি না পেলেও, আগের চাইতে এ সত্য যেন আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। জয় অত সহজে দমবার পাত্রী নয়। বুদ্ধিমতী সে, মনে আশাও রাখে।

সে জানে, মানুষের মনের চাহিদা কেবলমাত্র তার মা-বোন-মেয়ের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। বাড়তি অংশটুকু পূরণের জন্য চাই ভিন্ন প্রকৃতির এক নারী। সঙ্গিনী হোক আর পত্নীই হোক। তাই এখনই হতাশায় মনকে ভরিয়ে ভোলার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। সে বলল, ডীয়ার মেল। এতো দিনের দীর্ঘ মানসিক ব্যবধান চট করে আর সহজে কমিয়ে আনার আশা করতে পার না তুমি। এর জন্য তোমায় ধৈর্য ধরতে হবে। সহনশীলরূপে নিজেকে উপস্থিত করতে হবে। সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। তুমি ওর মনের পুঞ্জীভূত নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য এ যাবৎ কী কী প্রচেষ্টা করছে তা জানতে পারি কি?

যা যা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে, সবকিছুই চেষ্টা করেছি। তবু ওর যেন কোন কিছুতেই রুচি বা আগ্রহ নেই। বেশীরভাগ সময়েই নিজের ঘরে শুয়ে বসে পপমিউজিক শোনে। কতবার বলেছি : খেলাধূলা করতে চাও? ক্লাবে যেতে ইচ্ছা করে? পড়াশুনোয় আগ্রহ আছে? নাচ-গান শিখতে চাও? সব প্রশ্নের জবাবে সেই বাঁধা-ধরা গদ, না। কেবল ওর একটা বিষয়ের প্রতি অসীম উৎসাহ বার বার লক্ষ্য করেছি। সেটা হলো বেঁটে এডরিসের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন দেখা করতে যায়। এই ব্যাপারটা আমার খুবই অপছন্দের। একজন সম্ভ্রান্ত মানুষের মেয়ে হয়েও টু হুট করে সামান্য একজন ওয়েটারের সঙ্গে মেলামেশা করবে–আমি এটা একদম বরদাস্ত করতে পারিনা তাই ভাবছি, ওদের মধ্যে দেখাশোনা বন্ধ করে দেব।

জয় শান্ত কণ্ঠে বলল, এটা করা উচিত হবেনা, মেল। ভেবে দেখ,বালিকা বয়স থেকে তোমার মেয়ে তাকে পরিবারের একজন বন্ধুর চোখেই দেখে আসছে। তোমার অনুপস্থিতিতে কাণ্ডারীহয়ে আপদে-বিপদে সে তাদের পাশে থেকেছে। তাই আজ হঠাৎ

করে তার অস্তিত্বকে তোমার মেয়ের মন থেকে হেঁটে ফেলতে পার না তুমি। তাছাড়া, তুমি বাড়িতেই বা থাক কতক্ষণ? সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়, আর ফের দিনের আলো শেষে। একনাগাড়ে গান শুনে বেচারীআর কতটা সময়ই বা কাটাতে পারে বলো তো? আর অন্যগুলোর প্রসঙ্গ তুলছ? মেয়ে সব জিনিস পছন্দ করে না। আমার একটা পরামর্শ শুনবে মেল?

বল।

–তোমাদের ব্যাঙ্কে নোরেনাকে একটা কাজ পাইয়ে দাও। সকাল সন্ধ্যে পাঁচজন সমবয়সী মেয়ে পুরুষ আর নানা ধরণের ক্লায়েন্ট আর কাজের মধ্যেও ডুবে থাকবে। মনেরও পরিবর্তন হবে।

মেল সঙ্গে সঙ্গে এই কথার কোন জবাব দিলেন না। কথাটা তার মনে ধরল।

ইরা যে এত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে এ বিশ্বাস কিছুতেই এডরিসের মন মেনে নিতে পারছিল না। তাই গম্ভীর মুখ করে বলল, বেবী! ঠাট্টা-তামাসারও একটা সীমা থাকা দরকার।

–সত্যি বলছি, টিকি, আগামী কাল থেকেই আমি কাজে জয়েন করব।

এডরিস কিছুক্ষণ ফ্যা ফ্যা করে তাকিয়ে রইল ইরার মুখের দিকে। পূর্বের বিহ্বলতা কাটিয়ে মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে উঠল, সত্যিই ইরা, বাস্তবিক একখানা খেল

দেখালে তুমি! তা মিঃ ডেভনের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে এতো অল্প সময়ে কাৎ করলে কী ভাবে?

ইরার মুখে জবাব রেডিই ছিল, এতে শীগগীর আমার পিতামহাশয় কাৎ হতেন না, যদি না এর পেছনে আর একজনের ছায়া বর্তমান থাকত।

এডরিস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : সে আবার কে?

আমার পিতৃদেবের একজন বান্ধবী আছে। গত পনেরো দিন ধরে আমার হাবভাব দেখে পিতামহাশয় বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কী ভাবে সে আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন? তা ভেবে পেলেন না। শরণাপন্ন হয়ে পড়লেন তার সেই বান্ধবী প্রেমিকার ওপর। সেই পিতাকে বলল :তোমার মেয়েকে যদি ফিরিয়ে আনতে চাও, তবে তাকে কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দাও। দেখবে মনের দিক থেকে তখন তুমি অনেক সুস্থ। পিতৃদেব তার কথা ফেলতে পারলেন না এবং নিজেও অনুধাবন করলেন আমার নিঃসঙ্গ একাকিত্ব সঙ্গীন অবস্থার।

তারপর আর কি। অগত্যা কথাটা উত্থাপন করলেন আমার নিকটে আমি নানা-না করেও তার কথায় সম্মতি দিয়ে দিলাম।

-কোন্ ডিপার্টমেন্টে তোমায় ঢোকাচ্ছেন তোমার বাবা, সে সম্বন্ধে বলেছেন কিছু?

না, তা কিছু বলেননি, তবে এটুকু জানিয়েছেন : যেটা আমার ভালো লাগে আমার উপযুক্ত বলে মনে হবে, সেটাই বেছে নেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ওপরেই নির্ভরশীল।

–তবে আর কি, সোৎসাহে বলে উঠল এডরিস। তুমি তোমার বাবাকে জানিয়ে দেবে যে, অ্যাডিং মেশিন আর কম্পিউটার তুমি ভালোভাবে সামলাতে পার, কাজে কাজেই তোমাকে যেন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টেই রাখা হয়। এরপর এডরিস কতকটা আত্মগতভাবেই বলে বসল : প্রথম চাল চালার আগে আমাদের জানতে হবে, ব্যাঙ্কের ডেড সেফস্ গুলো কোথায়?

–ডেড সেফস! তার মানে? ভুরু কুঁচকে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করল ফিল। এতক্ষণ সে নীরবে উভয়ের কথোপথন শুনছিল ঘরের এককোণে বসে, হাতে ধরা মদের গ্লাস।

–যে সেফগুলো দীর্ঘদিনের জন্য ব্যবহার করা হয় না, তাদের বলে ডেড সেফস্। আমেরিকা বা ইউরোপের নানান অঞ্চল থেকে টাকার কুমীরের দল এই শহরে ছুটি কাটাতে এসে এগুলো টাকা দিয়ে ভাড়া করে। টাকা পয়সা..সোনা-দানা..হীরেজহরতে ঠাসা। মন চাইলে বার করে খরচ করে, আবার বেটিং-এ অন্য কোন ভাবে কিছু টাকা উপার্জন করে সেগুলোও জমা রাখে এই সেফে।

ছুটি ফুরোলে চলে যায়। সে ঐভাবেই ঠিক পড়ে থাকে। আবার এক দেড় বছর বাদে যখন ছুটি মেলে, আসে ওখানে। বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সেফগুলো আবার কাজে লাগায়।

তারপর ইরাকে উদ্দেশ্য করে বলল, অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে একবার ঢুকতে পারলে এই ডেড সেফগুলোর নাম্বার, মালিকের পরিচয়,কতদিন হবে সেগুলোতে হাতের কোন স্পর্শ পড়েনি। ইত্যাতি ইত্যাদি জানার সুযোগ, সুবিধা দুই আছে।

ফুঁসে উঠল ফিল : তুমি একটা মাথা মোটা উজবুক! ডেড সেগুলোর নম্বর বা হালচাল জানতে পারলেই বা কোন লাভে লাভবান হচ্ছ একবার শুনি? তোমার ক্ষমতায় কুলোবে সেগুলোর ধারে কাছে পৌঁছবার? জান না, এই ব্যাঙ্কটা আমেরিকার দুর্ভেদ্য ব্যাঙ্কগুলোর অন্যতম?

এডরিস তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ততোধিক তাচ্ছিল্যের সুরে সুর মিলিয়ে বলল, কে যাচ্ছে ওগুলোর ধারে ঘেঁষতে? আগে আমার প্ল্যানটা তৈরী হোক, তারপর দেখো আমি কী করতে পারি। এটা আমার কেয়ারফুল প্ল্যান করা নিখুঁত অপারেশন। এতে বেশ কিছু ধাপও আছে। প্রতি ধাপ বিচার-বিবেচনা করে, চিন্তা করে, সাবধানে সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগোতে হবে। আমার প্ল্যানের পয়লা নম্বরের ধাপ ছিল :ব্যাঙ্কের মধ্যে আমার নিজের তরফ থেকে কাউকে ঢোকানো এবং বেশ ভালো পজিশনেই ঢোকানো। প্রথমাংশ ভালভাবেই পার হয়ে এসেছি। দ্বিতীয়াংশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ইরাকে।

দ্বিতীয় ধাপ হলো : ডেড সেফগুলোর সন্ধান করা।

তৃতীয় ধাপ হলো : ডেড সেফগুলোর চাবি..অর্থের পরিমাণ...যেখানে অক্ষত রয়েছে। সেগুলো, সেখানে ঠিক কী ধরণের পাহারার বন্দোবস্ত আছে, তা জানা। এভাবেই ধাপের পর ধাপ রয়েছে আমার ছক করা প্ল্যানে। এগুলো বুদ্ধি, সাহসের পরিচয় দিয়ে পার হতে পারলেই একেবারে কেল্লা ফতে।

এতসব কাণ্ড করতে তো একটা বছরই কেটে যাবে ওর।

–তা তো যেতেই পারে, এডরিস মাথা নেড়ে বলে উঠল। সময় যাই লাগুক, ফলটা কিন্তু অমৃতই হবে।

ইরা এবার উঠে দাঁড়ায় চলে যাবার জন্য। বলল, আমার আর ঘন ঘন তোমার এখানে আসা চলবে না, টিকি। এখন থেকে আমার একটাই পরিচয় ওয়ার্কিং গার্ল দেবার মতো সংবাদ যদি কিছু থাকে তাহলে তোমার সঙ্গে আমি নিজেই সাক্ষাৎ করব। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। সো লং টিকি।

চলে গেল ইরাফিলের দিকে একবার ফিরে তাকালও না বা তাকে কোন সম্ভাষণও জানাল না। ফিল এই মেয়েটার দাম্ভিক আচরণে মনে মনে বেজায় চটে গেল।

আরও দিন পনেরো পরের কথা

দীর্ঘ দু সপ্তাহ ধরে ইরার দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল এডরিস।

এখন তার কী করণীয় এই চিন্তায় যখন সে বিভোর, তার এই বিভোরতা দূর করতে স্বয়ং ইরা এসে হাজির।

এসো এসো। ভেতরে এসো। কী দুর্ভাবনায় তুমি যে ফেলেছ। সেই যে গেলে এই কদিন তোমার টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। ব্যাপার কী?

–কিছুই না, কাজের মধ্যেই ডুবে ছিলাম, একটা সোফায় বসতে বসতে ইরা জানালো। তারপর হাতের মুঠো খুলে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বার করে এডরিসের দিকে বাড়িয়ে ধরে মুচকি হাসি হেসে বলল, আশা করি কাজ শুরুর পক্ষে এটা নেহাৎ মন্দ হবে না তোমার কাছে।

এডরিস কাগজটা নিয়ে ভাজ খুলে আগাগোড়া দেখে দুচোখ বোলাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল : ডেড সেফগুলোর নম্বর?

–হ্যাঁ। মাত্র কয়েকটার। লাখপতি, কোটিপতির ভাড়া করা সেফগুলো। তবে এর মধ্যে। কতটা কী আছে, তার কোন যথার্থ রেকর্ড নেই ডিপার্টমেন্টের খাতায়। শুধু কে কত টাকা তুলেছে তার হিসেব রয়েছে। ভ্রূর বহর দেখে মনে হলো সেফগুলোয় অঢেল অর্থ আছে। আরও একটা সংবাদ পেয়েছি, পাঁচজন টেক্সাস অয়েলম্যান এই সপ্তাহের শেষে দেশে ফিরে যাবে। ক্যাসিনোয় গিয়ে জুয়া খেলে প্রচুর বাজি জিতেছে তারা। টাকাগুলো তাদের সেফে জমা রাখা যাবে বলেই মনে হয়। তাদের সেফের নম্বরও লিখে দিয়েছি ঐ ডানদিকের কলামে।

–চমৎকার! এডরিস হাসি হাসি মুখে জবাব দিল। এবার আমাদের জানতে হবে ওখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম কেমন।

–তাও শুনেছি। হাত ব্যাগ বের করে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোয়ারকুণ্ডলীছাড়তে ছাড়তে ইরা তার বক্তব্য পেশ করল:আমার পিতৃদেব ভেবেছেন, ব্যাঙ্কে আমি আমার ভবিষ্যত গড়ার জন্য খুবই উদগ্রীব। তাকে একবার মুখ

ফুটে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ওখানে সিকিউরিটির বন্দোবস্ত কেমন অকপটে উগরে দিলেন আমার কাছে।

–কী রকমের সিস্টেম? সাগ্রহে জানতে চাইল এডরিস।

–কড়া পাহারা, ভয়ানক কড়া বললেও অত্যুক্তি হবে না,বলল ইরা। ছ-ছজন সশস্ত্র গার্ড সারারাত ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে তাদের কর্তব্য পালন করে। পাহারাদারদের প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। তাদের নিয়ে চলা আর জীবন্ত বোমা নিয়ে নাড়াচাড়া করা প্রায় সমতুল্য ব্যাপার। এখানেও নিষ্কৃতি নেই, তাদের সঙ্গে গোটা কয়েক কুকুরও আছে। ব্যাঙ্কের নীচে তিন ইঞ্চি মোটা স্টীলের চাদর দিয়ে তৈরী সে এক-একটা। ঘরটা আগাগোড়াই চারফুট পুরু কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে ঘরটা জলে ভরিয়ে দেওয়া হয় আবার ভোর ছটা বাজতে না বাজতেই সেই জল বার করে নেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। অনুধাবন করতে কষ্ট হচ্ছে না যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার।

আর দিনের বেলায়?

–জনাবারো বুলেট প্রুফ জামা পরা গার্ড অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে পাহারায় অটুট। কী চেহারা এক একজনের! সাক্ষাৎ দৈত্য যেন। তাছাড়া অ্যালার্ম আছে জায়গায় জায়গায়। পুলিশের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে সর্বক্ষণ। পরিশেষে ঘন ঘন চেকিং।

ইরার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দমবন্ধ করে একাগ্রচিত্তে এডরিস তার কথা শুনে গেল। সে নীরব হলে এডরিস গম্ভীর মুখে বলল, আচ্ছা বেবী বলতো, ঐ ভল্টে একমাত্র কাদের যাওয়ার সুযোগ আছে?

–অবশ্যই ক্লায়েন্টদের। তবে হ্যাঁ, আর একজন যেতে পারে–সে হলো ঐ ব্যাঙ্কের রিশেপসনিস্ট। সেই ক্লায়েন্টদের সঙ্গ দেয় তাদের ভল্টের নাগাল পৌঁছন পর্যন্ত।

–তুমি দেখেছ, তাকে?

–দেখেছি বৈকি! তার নামও জানি, ডেরিস ক্লিয়বি। বয়স তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ হবে। গত আট বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যাঙ্কে কাজ করে এতদিনের সম্মান অটুট রেখেছে। মনে হয় ওকে আয়ত্তে আনা মোটেই সোজা নয়।

-ওর ঠিকানা জানা আছে তোমার?

জানা নেই বটে, তবে জেনে নিতে তেমন অসুবিধা হবে না।

-ঠিক আছে, ঠিকানা যত তাড়াতাড়ি হয় সংগ্রহ করে নাও। তারপর না হয় আমায় ফোনে জানিয়ে দিও।

-ওকে।

আচ্ছা ওর কাজ কর্মের ব্যাপারে তোমার কিছু জানা আছে?

হ্যাঁ, জানা আছে। ধরে নাও তুমি ওর হবু ক্লায়েন্ট, তুমি একটা সেফ ভাড়া নিতে ইচ্ছুক। প্রথমে ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা ফর্ম ভর্তি করতে হবে নিজের নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়ে। লিখতে হবে কতদিনের জন্য তুমি সে ভাড়া নিতে চাও আর কতবার তা ব্যবহার

করার বাসনা মনে পোষণ কর। ফর্ম ভর্তি হলে ভাড়া গুণে নিয়ে, তারা তোমার হাতে একটা চাবি তুলে দেবে। ঐ চাবি যদি কোনভাবে হারিয়ে যায় তবে সে ভাঙ্গা ছাড়া অন্য কোন উপায় তখন থাকবে না। কারণ কোন ডুপ্লিকেট থাকে না ঐ চাবির। প্রত্যেকটি সেফের জন্য দুটো করে চাবি।একটা থাকবে তোমার কাছে, অপরটা অর্থাৎ পাসকী থাকবেব্যাঙ্কের হেফাজতে। চাবিদুটো একসঙ্গে পর পর ব্যবহার না করলে ভল্ট খোলা যাবে না। এই চাবি ব্যাঙ্কিং আওয়ার্সে থাকে ডেরিসের জিম্মায়। ছুটির পর চলে যাবার সময়ে ঐ পাসকীগুলো সে দিয়ে যায় ব্যাঙ্কের চীফ গার্ডের হাতে। তুমি যখন তোমার সে খুলতে চাইবে তখন তোমার চাবিটা দিতে হবে ঐ চীফ গার্ডের হাতে। সে তোমার চাবিরনম্বর...তোমার নাম...তোমার ছবি..যা তার কাছেএকটা খাতায় সযতে টোকা আছে, একবার চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলেই তোমায় ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেবে। সিঁড়ি বেয়ে মাটির নীচের ঘরে এরপর নামতে হবে তোমায়। সিঁড়ির প্রায় কাছেই চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে থাকে। ডেরিস। তুমি তোমার চাবির নম্বর তাকে বলে দিলে সে তখন ঐ নম্বরের পাসকী বার করে, তোমায় নিয়ে যাবে, তোমার ভাড়া করা সেফের দোর গোড়ায়। পাস কী দিয়ে সেফের লকটা খুলে দিয়ে সে ফিরে আসবে পুনরায় তার টেবিলে। তুমি পরের লকটা খুলবে কিন্তু তোমার চাবি দিয়ে।তারপর তোমার প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম সেরে নেবে।কাজ শেষ হলে সেফের গায়ে লাগানো পুশ বাটন টিপে ঘণ্টা বাজলেই ডেরিস এসে সামনে দাঁড়াবে। তারপর দুজনের চাবির সাহায্যে সেল করে দিয়ে তোমায় পৌঁছে দেবেচীগার্ডেরকাছে।এই হলো তার কর্মকাণ্ডেরব্যস্ততার ফিরিতি।

ইরার কথা শেষ হলে এডরিস কিছুক্ষণ আপনমনেকী যেন ভাবল,তারপরবহুক্ষণ ধরেচুপচাপ বসে থাকা ফিল আলগিরকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, শোন ফিল, এবার তোমার কাজ।ইরা সেই ডেরিস মেয়েটার ঠিকানা এনেদিলে তোমাকে তার একটা

ব্যবস্থাকরেদিতে হবে।কমকরেহলেও দিন পনেরোর জন্য সে যেন ভুল করেও অফিসমুখোহতে না পারে। আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারছ?

–তাতে সুবিধেটা কী হবে? হতবুদ্ধি ফিল প্রশ্ন না করে পারল না।

–তাতে সুবিধেটা এই হবে মিঃ ব্লকহেড ইরা তার পিতৃদেবকে বলে ঐ পনেরো দিনের জন্য ডেরিসের জায়গায় কাজে নামবে। আমার স্থির বিশ্বাস, মিঃ ডেভন না করতে পারবেন না। বরঞ্চ এই মধ্যস্থতায় তিনি খুশি ছাড়া অখুশি হবেন না। এই ভেবে যে তার সন্তানের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও উৎসাহ কিছু কম নয়। আর ইরার প্রধান কাজই হবে ক্লায়েন্টের চাবির আর পাস কী গুলোর ছাপ নেওয়া।

-বুঝলাম। কিন্তু ক্লায়েন্টরা তাদের নিজেদের চাবি ওর হাতে বিশ্বাস করে ছাড়বে কেন? এর পরিবর্তে হয়তো তখন চটে বলেই বসবে : জাহান্নামে যাও তুমি?

এডরিস সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, ওহে বুদ্ধির ঢেঁকি,ইরার দিকে ভালোকরে চেয়ে দেখার সময় হয়েছে কখনো? সাংঘাতিক সেক্স বম্ব। ও যদি মিষ্টি হাসি হেসে চোখ মটকে বুক উচিয়ে মধুমাখা মুখে চাবিটা হাত পেতে চায় এই বলে : স্যার আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? বিশেষ করে বৃদ্ধ টোসটাকার কুমীরগুলোকে, শুধু তারাই বা কেন, তাদের পিতারা পর্যন্ত আহ্বাদে গদ গদ হয়ে নিজেদের চাবি ইরার হাতে খুঁজে দেবে। লোকচরিত্রের কিছু জ্ঞান আমারও আছে। তোমার কথাই ধরা যাক, তুমি পারবে কী কোন সুন্দরী তরুণীকে জাহান্নামে যাও বলতে?

ফিল এই আক্রমণের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না। তাই আপন মনেই মাথা চুলকোতে লাগল।

এডরিস মাঝ পথে থেমে যাওয়া বক্তব্যকে একটানতুন দিকে পাক খাইয়ে বলল :ইরার হাতের তেলোয় লুকোন থাকবে চাবির ছাপ নেওয়ার এক টুকরো পুটি।

ইরা ছাপ এনে দিলে তুমি তার থেকে চাবির নকল তৈরী করে ফেলবে। তুমি আগামীকালই চলে যাও ব্যাঙ্কে। একটা সেফ ভাড়া নেবে। তাতে পেট মোটা একটা আজে বাজে কাগজ পুরে জমা করবে। সেই সঙ্গে ডেরিস মেয়েটাকেও ভাল ভাবে চোখে চোখে রাখবে, পরে যাতে চিনতে কোন রকম অসুবিধায় পড়তে না হয় তোমাকে। তারপর ইরা ঐ মেয়েটার ঠিকানা এনে দিলে, সময় বুঝে সেখানে গিয়ে তাকে দিন পনেরোর জন্য অচল করে আসবে। কিন্তু সাবধান! এমন কিছু বোকামি করে ভুল পদক্ষেপ ফেলনা, যাতে পুলিশের টনক নড়ে ওঠে। বুঝেছ?

–তা না হয় হলো। কিন্তু আমার সে ভাড়া করার কারণটা মাথায় ঠিক ঢুকল না।

–ঐ পনেরো দিন ধরে ইরা যে কটা ডেড সে যে পরিমাণে যতটা ফাঁকা করতে পারবে তা এনে তোমার ভাড়া করা, সেফে বোঝাই করবে। তুমি প্রতিদিন একবার করে অন্ততঃ সে ব্যবহার করার শর্তে–প্রতিদিন ব্যাঙ্কে পদধুলি দেবে আর মাল বার করে নিয়ে আসবে। কারো মনেই কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হবে না কারণ তুমি নিজে একজন জেনুইন ক্লায়েন্ট।কম করে। মাস ছয়েকের আগে ঐ সেগুলোর হাতের ছোঁয়া লাগবেনা

কোন জনৈকের। যতোদিনে পড়বে। তখন আমরা ধরা ছোঁয়ার অনেকবাইরে চলে যাব।কী,আর কোন অসুবিধা হচ্ছেনা তো বুঝতে?

ফিল আর ইরা এডরিসের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সত্যি এখন নির্বাক প্রতিমূর্তি।

৫-৬. এডরিসের প্ল্যান

০৫.

এডরিসের প্ল্যানে কোন গরমিল নেই, নিখুঁত বলেই প্রমানিত হল। ঠিকানা পাবার পর ফিল ডেরিস ক্লিয়বির ফ্ল্যাটে গিয়ে তাকেসিঁড়ি দিয়ে পা হড়কে গড়িয়ে পড়ার নিখুঁত ব্যবস্থা করে আসার পর, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ডেরিস পা ভাঙল আর মাস খানেকের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইল নিজের শোবার ঘরে।

ইরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তার পিতৃদেবের কাছে দরবার জানাতে তিনি প্রথমেই কুঁইকুঁই করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন ডেরিসের অনুপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বিঘ্নিত হবার ভয়ে।

প্ল্যান অনুযায়ী একদিনব্যাঙ্কের ছুটির পর এডরিসের অ্যাপার্টমেন্ট আর ফ্লোরিডা ব্যাঙ্ক থেকে কিছু দূরে অন্য এক জায়গায় একটা মাঝারি সাইজের রের্তোরাঁয় প্রবেশ করে ফিলের হাতে ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ডেরবাসতুলে দিয়ে ইরা বলে উঠল, এতে গোটাকতক পাসকীর ছাপ রয়েছে। আপাততঃ এই দিলাম, তবে সময় আর সুযোগ বুঝে অন্য পাসকীর ছাপও এনে দেব, টিকিকে বলে দিও।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ রেস্তোরাঁয় থাকার পর বেরিয়ে এলো ইরা। পিতৃদেবের উপহার স্বরূপ দেওয়া ছোট কিন্তু শক্তিশালী টি, আর, চার মডেলের গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল বাড়ির অভিমুখে।

এত বিলাস বৈভবআরআরাম স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থেকেও ইরারমনেকিন্তুসুখ ছিলনা। দারিদ্র্যের আর অভাবের জ্বালা বর্তমানে নেই কিন্তু যৌবনের জ্বালা? দৈহিক ক্ষুধা? অবশ্য মন চাইলেই গুপ্ত শয্যাসঙ্গীর অভাব তার হবে না সত্যি, কিন্তু তার সারা দেহ-মন জুড়ে সেই জেমস ফার অদৃশ্য ভাবে বিরাজ করছে। সেই সুখ আর তৃপ্তির স্মৃতি কি কখনও স্মরণে না রেখে পারা যায়? নিয়ম করে হপ্তায় চারদিন যৌনক্রীড়ায় মেতে উঠত সে আর ফার। দুইটা কী পৈশাচিকরূপেই তাকে গ্রহণ করত। তার লালসার কাছে হার মানতে হতো।ব্যথায় আর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ইরার চোখ ফেটে জল আসতে চাইত। তবু সেই নিষ্ঠুরতার শেষে যে স্বর্গসুখ, যে অনির্বচনীয় তৃপ্তির স্বাদ ইরা পেয়েছে, তার তুলনা কোথায়? পারবে কী এইসব গুঁড়ি গুডি ছেলেরা সেভাবে তাকে সুখের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে? মাস খানেক হলো ফারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ইরার মতো ফারও নিশ্চয়ই সতী সেজে বসে নেই।

কোন দুঃখেই বা সাজবে? তার মতন পুরুষের কাছে কী মেয়ের অভাব? লিয়াই হয়তো স্ব মহিমায় আবার তার সাম্রাজ্যে ফিরে এসেছে। নাঃ চিঠি লিখে, প্লেন ভাড়া পাঠিয়ে তাকে আনতেই হবে। সত্যি এই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আর সহ্য হয় না। কিন্তু মিঃ ডেভন যদি জানতে পারেন? তার ওপর রয়েছে টিকি আর ফিল। তাদের মনেও সন্দেহের সৃষ্টি করবে। তারা যদি এই ভাবে যে ইরা তার দেহের তাগিদে ফারকে কাছে ডাকেনি নিকটে পাওয়ার উদ্দেশ্য এই সম্পত্তির আরো একজন ভাগীদার রূপে, তখন? চিন্তায় ডুবে গেল ইরা। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? এদিকে ফারকে চা-ই চাই। না হলে চলবে না।

.

ছফুটের ওপর লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া বলশালী চেহারা হায়াম ওয়ানাসির। বয়স প্রায় তেষট্টি। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। টেক্সাস কোটিপতি, দেড় মাস প্যারাডাইস সিটিতে ছুটি কাটিয়ে আগামী কালই সস্ত্রীক ফিরে যাবেন স্বদেশে। তার এ ব্যাপার মোটেই ভালো লাগছিল না। কোথায় প্যারাডাইস সিটি আর কোথায় তার ডালাসের কাছে টেক্সস রেঞ্জ।

সেখানে শুধু কাজ, কাজ আর কাজ, মনকে ভোলাবার মতন কিছু নেই। মেয়েগুলো পর্যন্ত টেক্সাসের মত রুক্ষ, কঠিন আর রসকসহীন। তাদের সঙ্গে রোমান্সের কথা ভাবলেই অস্বস্তিতে সারা মন ঘিন ঘিন করে ওঠে।

কিন্তু এখানে? আহা! মধু! মধু!

বেলা তিনটের সময় ওয়ানাসির রোলস রয়েস কার এসে ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি গণমান্য আর বিশেষ পরিচিত একজন ক্লায়েন্ট। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই ব্যাঙ্কের গার্ডরা সসম্ভ্রমে আর সাবধানে অভিবাদন জানাল তাকে। লকার রুমের ক্ষেত্রেও তাই। সবাই তটস্থ।

চীফ গার্ড কুশল জিজ্ঞাসা করলে মুখ থেকে প্রকাণ্ড সিগারেট সরিয়ে বেদনার স্বরে বলে উঠলেন তিনি, মন ভালা নেই হে, তোমাদের এই শহর ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে। আবার আসব সামনের বছর।

নিয়ম-কানুনের ফর্মালিটি সেরে সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলাকার ভল্টরুমে নামতেই ওয়ানাসির চোখ ছানা বড়া! আরে, এ মেয়েটা আবার কে। কোন স্ত্রী পরী নয়তো, আগের সেই বদখৎ, ভাবলেশহীন, ফ্ল্যাট চেস্টের গোমড়ামুখো ডেরিস মেয়েটা কোথায় গেল? হায়াম ওয়ানাসিকে দেখে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মধুর ভাসিনী হাসি হাসল ইরা!

ইরার রূপ, যৌবন চোখে ধা লাগিয়ে দিল ওয়ানাসির। তিনি অপলকনেত্রে খাণিকক্ষণ চেয়ে রইলেন ইরার দিকে।

গুড আফটার নুন, মিঃ ওয়ানাসি, ইরা তার কাছে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল। আমি মিস ডেরিস ক্লিয়বির জায়গায় এসেছি–তবে সাময়িক ভাবে কারণ সে এখন সুস্থ নয়।

ওয়ানাসি ইরার সুঠাম গড়নের শরীরের উঁচু নীচু জায়গাগুলো, তার দেহের খাঁজ আর বাঁকগুলো জহুরীর দৃষ্টি দিয়ে বিচারপর্ব সারতে সারতে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কে, হনি? কী নাম তোমার?

-নোরেনা ডেভন।

ডেভন মেল ডেভনের নামের সঙ্গে চমৎকার মিল আছে দেখছি।

–উনি আমার বাবা।

–সত্যি? তোমার বাবা?সত্যি আশ্চর্যের কথা!আমি দশবছর ধরে এই ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্ট অথচ মেল ডেভনের যে তোমার মতন এক অপরূপা সুন্দরী বেবী ডল আছে তাই আমার অজানা ছিল!

-এতদিন পড়াশুনো নিয়ে ব্যত ছিলাম। ছোট থেকে বোর্ডিং, এখন পড়াশুনো শেষ করে ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না তাই বাবাকে বলে এখানে জয়েন করেছি।

কথা বলতে বলতে ইরা এমন ভুবন ভোলানো হাসি হাসল, এমন করে তাকাল যে তাতেই বৃদ্ধ ওয়ানাসি অর্ধেক কাৎ।

ইরা তার বলা জারি রাখল, একটু আগে ফোনে বাবা আপনার কথা বলছিলেন। আপনার খাতির যত্নের যাতে কোন জটি না হয় সে ব্যাপারে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। গোড়ার দিকে আমি খুব নার্ভাস বোধ করছিলাম। আপনাকে দেখে মনটা আগের চাইতে অনেক হাল্কা লাগছে। বলুন, কী করতে হবে?

আরো একবার মন কাড়া হাসি, সেইসঙ্গে বিলোল কটাক্ষ। যেটুকু অবশিষ্ট স্বরূপ পড়েছিল ওয়ানাসির তাও এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। এরপর বৃদ্ধ ওয়ানাসি তার লকারের কাছে নিয়ে গিয়ে তার চাবি আদায় করা, হাতের তেলোয় লুকিয়ে রাখা পুটিতে তার ছাপ নেওয়া ইত্যাদি কিছুই কঠিনরূপে ধরা দিল না ইরার কাছে। কিন্তু বৃদ্ধর সে সব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ কোথায়?তখন তিনি ড্যাব ড্যাব করে ইরার নিতম্বদ্বয়ের ওঠানামা আর সুউন্নত সুগোল স্তনজোড়ার আন্দোলন দেখতেই মোহিত। অন্যদিকে তাকাবার ক্ষমতাই তার এখন নেই।

সে খুলে একপাশ হয়ে সরে দাঁড়াল ইরা। হায়াম ওয়ানাসিযখন টাকাবার করতে ব্যস্ত ছিলেন, ইরা আড়চোখে চেয়ে যা দেখল তাতে তার চক্ষু ছানা বড়া :সেটা কম করে একশো আর হাজার ডলারের নোটে ঠাসা। কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর নেই। চোখ জোড়া মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল ইরার। বাপরে! এত টাকা!

বেশকিছু টাকা বের করে ওয়ানাসি ইরার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, আপাততঃ যা নিয়েছি, তা যথেষ্ট। আমার হয়ে তুমি না হয় সেটা বন্ধ করে দাও, হনি। আশা করব তোমার হাতের পরশে আমার এই সেটা চিরদিনই ফুলেফেঁপে থাকবে।

ইরা হাসি মুখে ওর আর নিজের চাবি নিয়ে সেফ বন্ধ করার জন্য ঝুঁকে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাণ্ড করে বসলেন ওয়ানসি। ইরা ঝুঁকে পড়ে সে বন্ধ করার কাজে যখন ব্যস্ত, বৃদ্ধ ওয়ানাসি নিজেকে আর সামলাতে না পেরে পেছন থেকে দুহাত বাড়িয়ে ইরার স্তনযুগল সবলে মুঠো করে ধরে বার কয়েক মর্দন করেই ছেড়ে দিলেন। অন্যসময় আর অন্য স্থান হলে তার মুখে সপাটে জুতোর ঘাবসাইরা। পুলিশ ডাকত, গালাগালির ফোয়ারা ছোটাতো।এত সহজে ছেড়ে দিত না। কিন্তু এক্ষেত্রে মুখ বুজেই সে সবকিছু সহ্য করল। সে বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে শুধু বললেন, আপনার মতো গণ্যমান্য আর বিত্তবান মানুষের কাছ থেকে ঠিক এ ধরণের ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করিনি, মিঃ ওয়ানসি। আপনি আমার গুরুজন, আপনার নাভীর সমকক্ষ আমি, তার ওপর আপনার বন্ধুর মেয়ে। আমার সঙ্গে এই অশোভনীয় আচরণ আপনি কেন করলেন! যাক, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনো করবেন না, এইটুকু আশা আমি রাখতে পারি।

নিজের অজান্তে এই রকম ব্যবহার করার পর ওয়ানাসি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা তার মনকে আষ্টেপিষ্টে বিদ্ধ করছে। ঘামতেও শুরু করেছেন। তাই যত তাড়াতাড়ি হয় এখান থেকে সরে যেতে পারলে তিনি বেঁচে যান। ঝটকরে একটা একশো ডলারের নোট বার করে ইরার হাতে গুঁজে দিতে দিতে লজ্জিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, মনে কিছু করোনা হনি। ভুল করে সত্যি এক অনুচিত কাজ আমার দ্বারা হয়ে গেছে। এই টাকাটা রাখ, মন যা চায় তাই কিনো, আর দয়া করে মেলকে কিছু এ বিষয়ে বলোনা, কেমন, কেমন? আচ্ছা চলি, আবার আসব সেই সামনের বছর।

ওয়ানাসি চলে গেলে ইরা আপন মনেই হেসে উঠল। ভাবল, সামনের বছর এসে বৃদ্ধ যখন দেখবে তার হাতের ছোঁয়া বৃদ্ধর সে ভরপুর না হয়ে পরিবর্তে সব শূন্য হয়ে গেছে, ওর মুখের আর মনের অবস্থা তখন কেমন হবে!

পরের দিন সকাল নটা নাগাদ ইরা গিয়ে সেই রেস্তোরাঁয় হাজির হলো। ফোনে আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল এডরিসের সঙ্গে। এডরিস জানিয়েছিল, ফিল তার প্রতীক্ষায় সেখানে থাকবে। ইরা গেলে ওয়ানাসির চাবির ডুপ্লিকেট তার হাতে সেখানেই তুলে দেওয়া হবে। রেস্তোরাঁর এককোণে একটা টেবিল দখল করে তারই প্রতীক্ষায় বসেছিল ফিল। ইরাকে ঢুকতে দেখে হাত নেড়ে কাছে ডাকল। ইরা গিয়ে বসল টেবিলে। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে গেলে ফিল তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে, চারিদিকে একবার মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা দেখে নিয়ে, টেবিলের তলা দিয়ে নকল চাবিটা ইরার হাতে চালান করে দিল।

-খুব যত্নের সঙ্গে তৈরী করেছি এই নকলটা, ফিসফিস কণ্ঠে বলল ফিল, আশাকরি কোন ঝামেলা হবেনা। এগারোটা নাগাদ আমি যাব। আমার সঙ্গে শুধু একটা ব্রিফকেস থাকবে। তুমি পারবে না ঐ সময়ের মধ্যে টাকাগুলো আমার সেফে চালান করে দিতে?

মনে হয় পারব যদিও কাজটা সহজ নয়, বুকি আছে যথেষ্ট। লকাররুমের এককোণে ওয়ানাসির সে, তার ঠিক উল্টো কোণে তোমার। মনে হচ্ছে ঐ সময় সেখানে কারো পদধূলি পড়বে না। জবাব দিল ইরা।

–তবে ঐ কথাই রইল : ঠিক এগারোটার সময় আমি গিয়ে হাজির হচ্ছি ব্যাঙ্কে। তুমি তার আগেভাগেই এক সেফ থেকে আর এক সেফে টাকাগুলো পাচার করে রাখবে।ফিল এরপর তার ব্রেকফাস্ট সেরে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরে ইরাও।

দশটার একটু আগে ইরা এসে দাঁড়াল গ্রীল দেওয়া ভল্টরুমের দরজার সামনে। চীফগার্ড তাকে গুডমর্নিং জানিয়ে দরজা খুলে দিল। তারপর একে একে সইসবুদ, পাসকী দেওয়া ইত্যাদি প্রতিদিনকার নিয়মের বেড়াজাল পার হবার পর চীফগার্ড সহাস্যে জানাল: আজকে আপনার খুব পরিশ্রম হবে, মিস। একগাদা ক্লায়েন্টস শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দুপুর নাগাদ আসবেন মিঃ রস আর মিঃ লাজ্জা। দুজনেই কোটিপতি, ব্যাঙ্কের খয়ের খাঁ।ওদের একটু আদর-আপ্যায়ন করবেন।

–চিন্তা নেই, আন্ডুইক, সেদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। হাসি মুখে কথাগুলো বলে সিঁড়ি দিয়ে ইরা নেমে এল নীচে।

নিজের টেবিলে এসে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়াল ইরা। শুধু একবার চাইল নেমে আসা সিঁড়ির দিকে।না,গার্ডরা যেখানে পাহারা দিচ্ছে সেখান থেকে এই দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হবে না-যদি না ঝুঁকে বসে দেখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।ইরা আর সময় নষ্ট না করে চটপট ড্রয়ার খুলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রবার করে নিজের টেবিলসাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।একটু সময়ও নষ্ট করা উচিত হবে না। দশ বাজতে তখনও তিন মিনিট দেরি।

উত্তেজনা আর নার্ভাসনেসেইরার বুক ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে। স্কার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিলের দেওয়া চাবিটা একবার খুঁয়ে দেখল।

মুহূর্তের ইতস্ততা, আরও একবার সিঁড়ির দিকে চাইল, পরমুহর্তেইসব দুর্বলতার পাহাড় ঝেড়ে ফেলে সে দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে গেল ওয়ানাসির সেফের দিকে।

সেফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন মনে হলো, সে যেন একটা আগ্নেয়গিরির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।তার অজান্তে যে কেউ এসে যেতে পারে এইভক্টরুমে এখান থেকে টেবিলনজর পড়ে না। সেও জানতে পারবেনাকারো উপস্থিতি। টেবিলে দেখতে পেয়ে, যেকেউযদিতারসন করতে করতে এখানে এসে পড়ে তবে তার অভাবনীয় কুকীর্তি অবশ্যই তার চোখে পড়বে।

একবার ঘড়ি দেখল ইরা। দশটা চার, আইকের কাছে সে শুনেছে লকার লেনেওয়ালা ক্লায়েন্টরা দুপুরের আগে আবার কখনো ব্যায়ে পা রাখেনা। কিন্তু দৈবাৎ কেউ এসে পড়ে, তবে? ক্ষণিকের জন্য ইরার শরীরের সারা স্নায়ুতন্ত্র যেন বিকল হয়ে পড়ল। ফিরে

যাবার জন্য সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাও ফেলল, জেমের কথা ভেবে সেই বাড়ানো পা আবার টেনে নিল ইরা। সেফ না খুললে আনবার টাকা কোথায় পাবে সে? মিঃ ডেভন তাকে হাত খরচের মতোই যা টাকা দিয়ে থাকেন, তাতে জেমের প্লে-ফেয়ার...পোষাক পরিচ্ছদ...খাই খরচ...রাহা খরচ...এ সমস্ত কখনই কুলোবে না। অতএব সেফ তাকে যেকোন উপায়েই উন্মুক্ত করতে হবে।

একটু চেষ্টা করতেই সেফ খুলে গেল। নাঃ, ফিলের বাহাদুরীও আছে বটে। নকল হলেও চাবিটা কাজ করছে একেবারে আসলের মতোই। সেফ খুলেই কী মনে করে একবার ঘুরে এলো তার টেবিলের কাছ থেকে।না, কেউ আসেনি। কেউ প্রতীক্ষায় নেই তার। শুধু গার্ডদের পদধ্বনি কানে আসছে মৃদু মৃদু, যেমন আগেও এসেছে বহুবার।

হাতের তেলো ঘামে ঘর্মাক্ত বৈজায় ভিজে। স্কার্টের গায়ে ভাল করে হাতমুছে নিল সে। ফিরে এসে ক্ষণিকের জন্য কাজে মন দিল। থরে থরে সাজানো টাকার বাণ্ডিল। একটা বান্ডিল টেনে দ্রুত গুণে দেখল ৪২,৫০০ ডলারের নোট আছে তাতে।

উফ! জীবনে এতোটাকার মুখ দেখার সৌভাগ্য এর আগে কখনও হয়নি–ছোঁয়া তো দূরে থাক। কিন্তু এই টাকায় জেমের যাবতীয় খরচ কুলোন সম্ভব হবে কী? আপাত দৃষ্টিতে মনে তো হয় না। তাই আরো একটা বাণ্ডিল টেনে নিল ইরা। তারপর স্কার্ট তুলে টাকার বাণ্ডিল দুটো সে তার প্যান্টির গার্ডল টেনে প্যান্টি আর তলপেটের খাঁজে সযত্নে ঢুকিয়ে দিল। অনেক ভেবে সে গার্ডল দেওয়া, প্যান্টি আর ঢিলে কুচি দেওয়া স্কার্ট আজ চাপিয়ে এসেছে।

এবার ফিলের সেফের জন্য টাকা নেওয়ার পালা। যা টাকা আছে সেটাতে সব নিতে গেলে তাকে চার-পাঁচ বার ছোটাছুটি করতে হবে। দেখাই যাকনা হয় এর শেষ।এই ভেবে সে ওয়ানাসির সেফ খালি করে টাকার বান্ডিলগুলো মেঝেয় একে একে নামাতে লাগল। একগোছানামানোর পর পরবর্তী গোছায় হাত দিতে যাবে, ঠিক এই সময়ে তার কানে এল সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।

মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখল ইরা। বুকের মধ্যে দমাদম মুগুর পিটতে লাগল এক অজানা আতঙ্ক। ভয়ে-আতঙ্কে লজ্জায় সারা শরীর হিম আর কঠিন হয়ে গেল। কেউ যেন এদিকেই আসছে।

স্তূপাকৃতি নোটের তাড়া আর উন্মুক্ত সেফ ফেলেই ছুটল ইরা।

টেবিলের সামনে স্বয়ং তার পিতা মেল ডেভন দাঁড়িয়ে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ইরা। দেহের সমস্ত রক্ত আর শক্তি নিঃশেষে কে যেন চো চো করে। শুষে নিল। আত্মসংবরণ করে নিজেকে কোন রকমে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাল ইরা। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো পিতার কাছে যেতেই স্বপ্নের ঘোরেই সে উচ্চারণ করল দুটি শব্দ, হ্যালো ড্যাডি...

মেল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চোখ মুখের অবস্থা শুকনো...ফ্যাকাসে...কী ব্যাপার? শরীর খারাপ?

কৈ নাতো! জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ফিকে হাসি হেসে ইরা জবাব দিল, আমি তো ভালোই আছি।

টেবিলে তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি কম অবাক হইনি। তা, ভেতরে কী করছিলে?

–আজ মিঃ রস আর লাঞ্জা আসছেন এখানে শুনলাম। তাই আগে ভাগে এটাই দেখে আসতে ভেতরে গেছিলাম। তাদের সে দুটোর অবস্থান, যাতে না তাদের এখানে এসে অযথা প্রতীক্ষা করতে হয়.অম্লান বদনে এক ঝুড়ি মিথ্যে বুলি গড় গড় করে আওড়ে চলল ইরা। সময়োচিত কৈফিয়ৎ আবিষ্কারের বাহাদুরীর বহর দেখে সে নিজেই ভেতরে ভেতরে খুব অবাক। মেয়ের কাজের প্রতি অনুরাগ আর ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন ডেভন। তিনি এই জানার প্রয়াস করলেন-খুঁজে পেয়েছ?

হ্যাঁ। তার বলা শেষ করে চেয়ারে বসে পড়ল ইরা। এইভাবে খুব বেশীক্ষণ ধরে কথা চালাচালি করার ক্ষমতা তার ছিল না। ড্রয়ার খুলে একগাদা কাগজপত্র টেনে বার করে, আপন মনেই যেন বলছে এমনভাবে বলে উঠল: কাজের আর শেষ নেই। এখন আবার এগুলো নিয়ে বসতে হবে।

মিঃ ডেভন ব্যস্ত হয়ে বলে ফেললেন, ঠিক ঠিক, তোমার কাজে অযথা বিরক্ত করা বোধহয় আমার উচিত হবে না। যাইহোক, এলাম যখন, একবার না হয় নিজেই ঘুরে দেখে যাই লকার রুমটা। এই বলে তিনি পা বাড়ালেন লকার রুমের গলিপথের দিকে। ভয়ে প্রাণ উবে গেল ইরার। তীরে এসে তরী ডুবল এবার বুঝি। সত্যি তাহলে ঠেকানো গেল না অবশ্যম্ভাবী বিপদকে। কয়েক পা ঘুরলেই ওয়ানাসির খোলা সে আর মেঝের

ওপর জড়ো করে রাখা নোটের তাড়া নজরে পড়বে তার। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিয়ে পিছু থেকে ডাকল ইরা : ড্যাডি!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেভন জিজ্ঞাসা করে উঠলেন : কী, ডীয়ার?

–জয়ের সঙ্গে আলাপ করাতে আমায় কখন নিয়ে যাচ্ছ?

সেই চরম মুহূর্তে ইরার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে দিল-মেল ডেভনকে যদি থামাতে চাও তবে জয় অ্যানসনির প্রসঙ্গ তোলার এটাই ঠিক সময়। যা ভাবা, বর্তমানে ঘটলও তাই। ডেভন শুধু ঘুরেই দাঁড়ালেন না, উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে আবার ফিরেও এলেন ইরার টেবিলের খুব কাছে।

–তুমি তার সঙ্গে আলাপ করতে সত্যি যাবে, ডীয়ার? আমার তো মনে হয়েছিল জয়ের অস্তিত্ব তুমি মেনে নিতে পারবে না।

ও ধারণা তোমার ভুল ড্যাডি।নানা কারণে আমার মন তখন বিক্ষিপ্তছিল বলেই আমি রাজী হইনি। কবে নিয়ে যাবে তাই বল না? আদুরে কণ্ঠে মধুর সুরে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করল ইরা।

–কবে কী? আজ রাতেই তোমাকে নিয়ে যাব আর আলাপও করিয়ে দেব। দেখবে, চমৎকার মানুষ সে। তোমার প্রসঙ্গ প্রায়ই উত্থাপন করে। তোমার প্রতি কী যত্ন নেব, সে বিষয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ আর নির্দেশবর্ষণ করে আমার ওপর।

ড্যাডি! টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে অদৃশ্য আঁকিবুকি কাটতে কাটতে ইরা বলল, জয়কে তুমি খুব ভালোবাস, তাই না?

ইরার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব সাবধানে উত্তর দিলেন তিনিঃ আমাদের দুজনের মধ্যে-আলাপ বহুদিনের। স্বাভাবিক কারণেই একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

জয়কে বিবাহ করতে চাও?

ডেভন অবাক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। ইরার মনোভাব বোঝার চেষ্টায় একটু সচেষ্ট হলেন। মুখে শুধু বললেন, তুমি কী বলে?

–আমার আর তোমার দুজনের জীবন যাত্রা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, আশা আকাঙ্ক্ষার চাহিদা যার যার কাছে তার নিজস্ব ধারায়। আমরা কী ভাবে চলতে চাই তার সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর করে আমাদের মন ও মর্জির ওপর। তাই এ ব্যাপারে আমার বলার-ই বা কী থাকতে পারে ড্যাডি?

-তুমি কেন এই সত্যটা বুঝতে চাইছ না নোরেনা, ইরার কাঁধে একটা হাত রেখে ডেভন প্রগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি আমার সন্তান। আমার ঘর সে তো তোমারও ঘর। আমি যদি জয়কে বিয়ে করে তাকে সসম্মানে ঘরে তুলিও, তোমার এ বিষয়ে বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে–তা প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক। তোমার ধারণাই ঠিক, জয়কে আমি বিয়ে করতে চাই। এক নয় দুই নয় ষোল বছর ধরে তোমার মায়ের জন্য দিন গুনেছি।

নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবার যা জ্বালা–এ বয়সে সেই জ্ঞান তোমার নেই। আজ ইহ জগতে সে নেই। তার পরিবর্তে তুমি এসেছ আমার নিভে যাওয়া ঘর আলো করতে। আর ভুল বুঝে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করেও সে যখন আসেনি তখন তাকে ভুলে থাকার চেষ্টাই করেছি। এখনকার পরিস্থিতি একটু আলাদা। বর্তমানে তার প্রতিভু তুমি।

তোমার এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ অধিকার আছে–আমার বিয়ে করা উচিত হবে না অনুচিত। আমি এবার নতুন করে ঘর বেঁধে সুখী হবার চেষ্টাই করব, না, করব না।

ড্যাডির মুখের দিকে তাকাল ইরা। তার মুখে সে কী দেখল, শুধু সেই জানে। সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলল, তুমি যাতে সুখী হবে তাই-ই করো ড্যাডি। তাকে তুমি হতাশ করো না। তোমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী জীবন-যাপন কর।

এমন সময়ে ইরার টেবিলের ফোন সশব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে লাগাল ইরা। ওপাশ থেকে অপারেটর জানাল : মিঃ ডেভন বোধহয় আপনার সঙ্গেই রয়েছেন, মিস ডেভন? থাকলে ওঁকে বলুন–মিঃ গোল্ডস্ট্যান্ড ওঁর জন্য ওঁর অফিসে বসেই অপেক্ষা করছেন।

ইরা সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা ডেভনকে জানাতে তিনি ইরার কপালে ঠোঁট ঠেকিয়ে আদর জানিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সেখান থেকে। ইরারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

মিঃ ডেভন চলে যেতেই ইরা ছুটল ওয়ানাসির সেফের দিকে। মেঝে থেকে টাকার বান্ডিলগুলো তুলে নিয়ে ওয়ানাসির সেফেই ভর্তি করে, সেফে চাবি লাগিয়ে ফিরে এসে বসে পড়ল আবার নিজের টেবিলে।

এগারোটার একটু পরেই ফিরে এল অ্যালগির। হাতে একটা বিরাট আকারের ব্রীফকেস। ইরার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

ফ্যাকাসে, ঘামে সিক্ত ইরার মুখ দেখেই তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করল, কোথাও কোন গণ্ডগোল বেঁধেছে নিশ্চয়ই। সে তাই কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? চাবিটা কাজে লাগেনি নাকি?

-না, না চাবি ঠিকই আছে। ধরা পড়তে পড়তে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। শোন ফিল, একাজ আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়।

তার মানে? টাকা তুমি বার করতে পারনি?

সাবধান! চেঁচিওনা,গার্ডরা শুনে ফেলতে পারে।কতবার এক কথা বলব যে, একাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমারই ভুল হয়েছিল তোমাদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া। জান, মিঃ ডেভন একটু আগেই এখানে এসেছিলেন। হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন আমায়। সবে ওয়ানাসির সে খুলে টাকার বান্ডিলগুলো বের করে মেঝেতে রেখেছি, ঠিক সেই সময়ে তার পদধ্বনি কানে আসে সিঁড়িতে। এখন তুমি বিচার করো, কী সঙ্গীন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একাই প্রতিকূলতার সঙ্গে। সংগ্রাম চালিয়েছি।

ফিল বুঝতে পারল ইরার সাংঘাতিক সমস্যার কথা। একটু ভেবে সে বলল,, সত্যি একাজ তোমার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ওকে। আমি কাজে নামছি এবার, তুমি এদিকটার দিকে বরং একটু দৃষ্টি দাও। কেউ এলে পেতলের এই পেপার ওয়েটটা মেঝেতে ফেলে সংকেত দেবে আমায়। ঠিক আছে? এবার চাবিদুটো দাও আর বলে দাও সেটা কোথায়?

.

০৬.

চোখে ঘুম না থাকায় শুয়ে শুয়ে নিজের কথাই বিভোর হয়ে ভাবছিল ইরা। সত্যি কী বিরাট পরিবর্তনের মুখ গহ্বরে এসে সে পড়েছে। মাত্র দেড় মাস পূর্বেও সে ছিল বস্তিবাসিনী এক মেয়ে। জীবন ছিল নিত্য অভাব, অসম্মান আর পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। সেইসঙ্গে কুৎসিত, কদর্য মানানসই পরিবেশ। চোখের সামনে ধরা দিতনা উজ্জ্বল আলোকময় ভবিষ্যতের মায়াবী কোন স্বপ্ন। স্বভাবে ছিল বেপরোয়া, দুর্দান্ত পরিশেষে বন্য। কিন্তু এখন?

বর্তমানে সে জীবন কাটাচ্ছে অগাধ প্রাচুর্যের মধ্যে। আপনা হতেই তার কাছে ধরা দিয়েছে নিরাপত্তার বেড়াজাল, সম্মান, বাড়ি-গাড়ি, সর্বোপরি মাথার ওপর অভিভাবকরূপে একজন আদর্শ পিতা।

যাঁর সংস্পর্শে এসে, স্নেহমমতা পেয়ে, তাদের আচরণে এসেছে ভদ্রতা, কোমলতা আর শালীনতার সুস্পষ্ট ছাপ।শুধু একটি মাত্র চিন্তা তাকে প্রবল ভাবে কুরে কুরে পীড়িত

করতে লাগল বারংবার। আগে তার পরিচয় ছিল এক সামান্য ছিঁচকে চোররূপে কিন্তু আজ পরিস্থিতি একটু পৃথক। আজ সে সামান্য থেকে তার ক্ষমতার জোরে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পুরোপুরি এক পাকা চোর হয়ে। উঠেছে।একজনের সরলতা, বিশ্বাস আর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে সে তার পিঠেই ছুরি মারতে উদ্যত হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। মেল যদি বুঝতে পারেন তার কন্যা তার পিতৃস্নেহের এই প্রতিদান তাকে দিতে আগ্রহী, তবে সে আঘাত তিনি মনে মনে পাবেন তা এক কথায় অবর্ণনীয়। ইরারও লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবেনা, এরপর কোন মুখে সে তার পিতার সামনাসামনি মাথা তুলে দাঁড়াবে।

বড় হওয়া অবধি মা বাবার স্নেহভালবাসা থেকে এতদিন সে বঞ্চিত ছিল। পিতৃ-মাতৃস্নেহ কী হয় তা ছিল একেবারে অজানা। কারণ মা ছিল খিটখিটে আর বদরাগী। বাবা ছিল পাঁড় মাতাল আর নরপশু। তার ভয়ে ইরা রাত্রে দরজা খুলে শুতে পারত না।

মদের নেশা চরমে উঠলে নিজের কন্যা আর স্ত্রীর মধ্যে কোন তফাৎ থাকত না তার কাছে।

ইতিমধ্যে জেমকে পত্রপাঠ বলেছে এখানে চলে আসবার জন্য। প্লেনভাড়া আর রাহা খরচের জন্য পাঁচশ ডলারও পাঠিয়ে দিয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে। জেম এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে টিকি এডরিস আর ফিল অ্যালগিরের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নিতে হবে। আর মনের দিক থেকে কোন সাড়াও পাচ্ছেনা বিপদেরবুকি আর অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে ওদের পেটের ক্ষুধা মেটাতে। লাজ্জা তো স্বভাবে মিঃ ওয়ানাসির চেয়েও এককাঠি সরেস। তিনি শুধু একটি কাণ্ড ঘটিয়েই সন্তুষ্ট হননি, ইরার স্তনে হাত দেবার

সঙ্গে সঙ্গে সবলে তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে চুম্বন করতেও ভুল হয়নি। গার্ডদের ডাকার ভয় দেখাতে তবে তাকে নিরস্ত করা গেছে। অবশ্য পুরস্কার স্বরূপ দুশো ডলার তৎক্ষণাৎই ক্ষতিপূরণ পেয়ে গিয়েছিল ইরা। এমন ক্ষতিপূরণের আশা সে স্বপ্নেও করেনা।

মিঃ লাজ্জার চাবির ছাপ নিতে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। শুধু পারেনি মিঃ রসের চাবির ছাপ নিতে। মহা ধুরন্ধর লোক এই রস। ইরার রূপ যৌবন সত্ত্বেও তার কাছে ইরার হার স্বীকার করতে হয়েছে। উদ্ধত যৌবনের অধিকারিনী তার এই রূপে রসকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ইরা। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে, মিঃ রসের চাবির ছাপ নিতে পারেনি বলে তার মনে কোন অনুশোচনা নেই। এর কারণ কি হতে পারে?

এমন কি চাবির ছাপ নিতে ফিল অ্যালগির যখন চুপি চুপি তাকে জানাল : ওয়ানাসির সে লুট করে পঞ্চাশ হাজার সরিয়েছে, একটুর জন্য হলেও সে তখনও কোন উত্তেজনা অনুভব করেনি ইরা। অথচ দেড় মাস আগে হলে উত্তেজনা আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে ফেটে পড়ত।

নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে বসে ইরা এখন সহজেই বুঝতে পারছে যে, আগের মতন টাকার মোহ আর তার মধ্যে নেই। এখন তার একটাই ইচ্ছা তা হল শান্ত ও স্থায়ী গৃহজীবনে সসম্মানে সমাহিত হওয়া।

এতোদিন পর্যন্ত সে যা যা করে এসেছে, তা কারো মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র উদ্রেক করতে পারেনি। সবাই তাকে জানে মেল ডেভনের মেয়ে নোরেনা ডেভন বলেই। প্রতি

পদেই সে পেয়েছে প্রতিজনের স্নেহ ভালোবাসামর্যাদা আর বিশ্বাস। কিন্তু যেদিন সে জালে ধরা পড়বে নোরেনা ডেভন পরিচয়ে নয়, একজন জালিয়াৎ, ঘৃণ্যপ্রতারক রূপে, সেদিন কিন্তু তাকে সোনার সিংহাসন থেকে টেনে নামাবে পথের ধুলোয়। তার অবস্থান হবে তখন কোন জেলখানায়।

অস্থিরতায় আর আতঙ্কে বিধ্বস্ত হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল ইরা। মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল সারা মুখ। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগল : না, না আর আমি পারব না এভাবে পরের হাতের পুতুল সেজে পিচ্ছিল পথ বেয়ে রসাতলের দিকে নেমে যেতে। মেল ডেভনের সঙ্গে আমি পারব না ছলনার কোন আশ্রয় নিতে। আমি সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেব টিকি আর ফিলকে : একাজ আমাকে দিয়ে আর হয়ে উঠবে না। তোমরা না হয় অন্য উপায় দেখে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল টিকির ভাবলেশহীন মুখ খানা। সাপের মতো জ্বর আর ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি। ওহ!সত্যি কী সাংঘাতিক বিপজ্জনক লোক ঐ টিকি। তার হয়তো সিংহের মতন থাবার জোর নেই, তবে পাইথনের মতন হিমশীতল মৃত্যুপ্যাঁচও উপস্থিত আছে। সেই মরণফাস থেকে রেহাই মেলা সুকঠিন।

আচ্ছা, মেলকে বলে আবার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে বদলীহয়ে গেলে কেমন হয়? সেখানে যেতে পারলে টিকির আর কিছু বলবার বা কইবার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার আর কী দোষ? কর্তার ইচ্ছায় ক্রিয়া। ব্যাঙ্কে তাকে অন্যবিভাগে বদলী করে দিলে তারই বা করার কী থাকতে পারে?

কথাটা ভেবে নিয়ে মনে একটু শান্তি পেল। আগামী কালই সে কথাটা উত্থাপন করবে তার ড্যাডির কাছে। শান্তির ঘুম নেমে এল ইরার দুনয়নে।

পরদিন সকাল এগারোটায় যথারীতি ফিল এসে হাজির। তপ্ত চোখে বলল, লাজ্ঞার সেফে টাকাকড়ি কোথায়? শুধুইতো দলিল দস্তাবেজ।

সেজন্য আমার করণীয়ই বা কী আছে?

–তোমার চোখে পড়েনি তার সে শুধু কাগজে ঠাসা?

না। তিনি আমায় ঘরে যেতে বলেছিলেন সে খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ইরার দিকে তাকিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গল্প করতে করতে বলে উঠল, লাঞ্চের আগে আর একটা চাবির ছাপ জোগাড় করে দিতে হবে, বুঝেছ? যেভাবেই হোক তোমাকে একাজ করতেই হবে। তোমার ওসব বিশ্রী অজুহাত আর চলবে না। চালাকির আশ্রয় নিতে হলে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে। রাস্তার ওপাশে যে কাফে রয়েছে সেখানে আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। এই বলে মুখ কালো করে চলে গেল হন্ হন্ করে।

নিজের টেবিলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বধিরইরা। মনে মনে সে ভীষণ বিচলিত। এই দেড়মাসে আজ তার কত পরিবর্তন ঘটে গেছে–এটাও তার একটা চিহ্ন। পূর্বের ইরা হলে ফিলের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়ে বসত উপহার স্বরূপ গালে চড় কষিয়ে। একজন মেয়ের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটা সম্বন্ধেও ইতরটা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ক্ষোভে ও রাগে অন্ধ হয়ে মুখ গোঁজ করে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল ইরা। এই চিন্তাই তার মনকে কুরে কুরে খেতে লাগল যে, এরপর তার করণীয় কী? ফিলতো ফতোয়া জারী করেই খালাস কিন্তু ওর ফতোয়া মতো কাজ করতে তার মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছিল না। অবশেষে ভেবে চিন্তে একটা মতলব বার করল ইরা। চাবির ছাপ পেলেই তো ওরা খুশী, বেশ তা না হয় দেবেইরা। আপাততঃ ওদের ঠেকিয়ে রাখবার এই একটিমাত্র পথ খোলা আছে। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক।

এইভেবে ইরা ভাড়া না দেওয়া পড়ে থাকা দুটো খালি সেফের পাসকীর ছাপ তুলে নিল চটপট। সেফে কী আছে জানার কোন আগ্রহ নেই ইরার, তাই এদিক থেকে সে মুক্তবিহঙ্গ।

সময়মতো লাঞ্চের সময় চাবি দুটোর ছাপ হাত বদল হয়ে পৌঁছে গেল ফিলের হাতে। ক্লায়েন্টের নাম বলল–মিঃ কুইকশ্যাংক আর মিঃ বিনাশ্যাডার। তারই দেওয়া নাম।

চাবি দুটোর ছাপ নিয়ে পকেটে পুরে ফিল জিজ্ঞাসা করল: এদের সেফে টাকা কড়ির পরিমাণ কীরকম, দেখেছিলে নিশ্চয়ই?

–না।

–তবে চাবির ছাপ নিলে কোন কৌশলে?

ওরা আমার হাতে চাবির গোছ তুলে দিয়েছিল শুধু লকটা খোলার জন্য।

ফিল সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে ইরার মুখের দিকে খাণিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। ইরা এই দৃষ্টিকে আর ভয় পেলনা। ফিল আপন মনে কী ভাবল সেই জানে, শুধু মুখে বলল, সন্ধ্যে ছটা নাগাদ টিকি তোমায় দেখাকরতে বলেছে তার ওখানে। অবশ্যই যাবে বলে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল ফিল।

টিকির ওখানে যাওয়ার মনোগত কোন তাগিদ ছিল না আজকের ইরার মধ্যে। কিন্তু যা সাংঘাতিক লোক এই টিকি, না গেলে তার বিপক্ষে আবার কী ফন্দি আঁটবে কে জানে। ইরা শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল।

ছটা বাজার কয়েক মিনিট পর, নিজের ডিউটি শেষ করে সেযখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসছে, লবীতে মেলের সামনা সামনি পড়ে গেল ইরা।

-কাজ শেষ হলো? হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

-হ্যাঁ আজকের মতন শেষ। আমার প্রস্তাবটার বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করলে নাকি, ড্যাডি?

-হ্যাঁ মাত্র দুসপ্তাহ অপেক্ষা কর। তারপরেই তোমার ছুটি। ডেরিস অবশ্য তার মধ্যে জয়েন করতে পারবে না, আমাদের নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চে খবর পাঠিয়েছি। তারা জানিয়েছে : হপ্তা দুয়েকের আগে তারা কাউকে এখানকার জন্য স্পেয়ার করতে পারবে না।

দুহপ্তা, মনে মনে এক অজানা অদেখা আতঙ্কে শিউরে উঠল ইরা। সে কী এ দুহপ্তা ধরে টিকি আর ফিলের মতো ঝানু লোককে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে? এছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই। আগামীকাল ওরা খালি সেফদুটো খোলার পর তাদের নজরে যখন কিছুই আসবেনা, সূত্রপাত ঘটে যাবে মূল ঝামেলার। ওদের কেমন করে রুখবে ইরা? একটামাত্র ভরসা শুধু এই যে রাত্রেই জেম এসে পৌঁছচ্ছে প্যারাডাইস সিটিতে। সে এলে দুজনে একত্রে বসে শলা-পরামর্শ করে যা তোক একটা উপায় বার করা কিছু কঠিন হবে না। এই ভেবেই তখনকার মতন ইরা তার মনকে শান্ত করল।

এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ইরা পৌঁছাল তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। তাকে দরজা খুলে নিজের হাতঘড়ি দেখতে দেখতে গম্ভীর কণ্ঠে এডরিস বলে উঠল, অনেক দেরী করে ফেলেছ। ভেতরে এসো।

এক সেকেন্ড ইতস্ততঃ করে ভেতরে প্রবেশ করল সে। খোলা জানালার কাছে রাস্তার দিকে মুখ করে ফিল অ্যালগির দাঁড়িয়ে দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

ভেতরে এসে সোফায় বসতে বসতে ইরা স্পষ্ট শুনতে পেল, এডরিস দরজা লক্ করে দিল। বুকে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। সে একা আর প্রতিপক্ষ দুজন। তার এই শোচনীয় অবস্থা কোণঠাসা বেড়ালের মতোই করুণ। ইরার মধ্যে পূর্বের সেই বেপরোয়া ভাব আবার স্ব-মর্যাদায় ফিরে এল। সে প্রস্তুত হলো শক্ত হাতে গোটা ব্যাপারটা মোকাবিলা করতে।

প্রথমে এগিয়ে এল ফিল, রাগে আর বিদ্বেষে সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে ইরার। সে নিজের বেল্ট খুলতে খুলতে কুৎসিত ভঙ্গিমায় বলে উঠল : ভাগ রে কুত্তীর বাচ্চি! আজ তোরই একদিন কীআমারই একদিন। আজ তোর গায়ের ছাল যদিনা ছাড়িয়ে নিই তবে আমার নামই ফিল অ্যালগির নয়। আমাদের সঙ্গে এরকম ধান্দাবাজি?

ফিল যখন তার প্যান্টের বেল্ট খুলতে সদাই ব্যস্ত, ইরা আত্মরক্ষার তাগিদে চট করে সামনের টেবিলে রাখা পেতলের ভারী অ্যাশট্রেটা হাতে তুলে নিয়েই এক ছুটে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সর্পিনীর মতো হি হি করে গর্জে উঠল, সাবধান, শয়তান! আমার দিকে আর একপাও এগিয়েছিস কী এই ভারী অ্যাশট্রেটা জানলা গলিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলব। তারপর পুলিশ আর পথের নোকজন এখানে ছুটে আসবে এই হাস্যকর ব্যাপার জানতে। তখন তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করিস দুজনে।

থমকে গেল ফিল।

বেগতিক দেখে টিকি ধমকের সুরে ফিলকে বলে উঠল : আহা! কী হচ্ছে কী ফিল? মাথা ঠাণ্ডা রাখ। ইরার ব্যাপারটা না হয় আমার ওপরই ছেড়ে দাও।

ফিল ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ইরার দিকে তাকিয়ে বেল্টটা আবার পরতে পরতে চলে গেল ঘরের অন্যপ্রান্তে। এডরিস্ গিয়ে বসল নিজের আর্মচেয়ারে। অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে ইরাকে একবার ডেকে বলল : এসো ইরা। ফিল তুমিও এসে বসো। ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করা যাক আর একবার গোটা ব্যাপারটা।

ইরা পর্যায়ক্রমে এডরিস আর অ্যালগির-এর দিকে তাকিয়ে সোফাটা একটু দূরত্বে–প্রায় দেয়ালের কাছাকাছি টেনে নিয়ে গিয়ে বসল। অ্যাশট্রেটা কিন্তু হাত ছাড়া করলনা।এডরিস কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইলইরার দিকে, তারপরবুলিগুলো কেটে কেটে বলল, আমি তোমায় বুদ্ধিমতী বলেই জানতাম। কিন্তু তুমি যে সেই বুদ্ধি আমাদেরই বিপক্ষে কাজে লাগাবার সাহসিকতার পরিচয় দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজের মন গড়া দুটো ভুয়ো নাম দিয়ে আমাদের প্রতারণা করার কী হেতু জানতে পারি?

ইরার বুক ঢিপঢিপ করে উঠল, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল জবাব দিতে গিয়ে। আজ যবনিকা নেমে আসবে গোটা ব্যাপারটার। তবে ইরা মনে মনে চিন্তা ভাবনাও সেরে নিল খুব তাড়াতাড়ি–আপাততঃ ভাবভঙ্গিমা দেখে যা মনে হচ্ছে তার মারাত্মক কোন ক্ষতি করা ওদের সাহসে কুলোবে না। কেননা, খোলা জানালা দিয়ে এই বাড়িরই কোন ঘর থেকে টেলিভিসনের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। তার মানে এ বাড়িতে জনপ্রাণী আছে। ওরা তাকে আক্রমণ করার পূর্বেই সে হাতের অ্যাশট্রেটা জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারে জন আর মন বহুল খোলা রাস্তায়, চিৎকার করতে পারে গলা ফটিয়ে। এই সব ভাবনা ভাবার পর থেকে একটু আশ্বস্ত হলো ইরা। গম্ভীর কণ্ঠে জবাবও দিল :আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকতে চাইনা। তোমরা তোমাদের পকেট ভরার জন্য অন্য কোন কৌশল ঠাওরাও।

এডরিস ইরার কথার জবাবেশয়তানের হাসি হেসে বলল, এরকম যে কিছু একটা ঘটতে পারে এরূপ সম্ভাবনা অনেক আগে থাকতেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ছাড়ব বললেই তো আর ছাড়া যায় না সব জিনিস। বিশেষ করে তোমার পক্ষে।হাসি থামিয়ে চট করে গম্ভীর

হয়ে গেল এডরিস। ভয়াল স্বরে বলল, তোমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবেই। আগামীকাল তুমি ব্যাঙ্কে গিয়ে ফিল-এর হাতে অন্ততঃ আরো দুটো জেনুইন চাবির ছাপ নিশ্চয়ই দিতে পারবে। এর অন্যথা যেন না হয়। বুঝেছ? আমার কথামতো যদি কাজ কর তবে তোমার এই অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব।

-না, আমি পারবনা।দৃঢ় স্বরে জবাব দিল ইরা। সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ফিল। তারপর একটা কুৎসিত-খিস্তি বর্ষণ করল। কোমরের বেল্ট খুলতে খুলতে বলল, কুত্তীটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও টিকি। ওর কী অবস্থা করি একবার দেখ।

–চুপ করো, ফিল। এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল এডরিস ফিলকে। তারপর ইরার দিকে চেয়ে বলল, তোমার যা যা বাসনা ছিল, তা খুব সহজেই তোমার কাছে ধরা দিয়েছে ইরা? বাড়ি গাড়ি-টাকা এমন কি মাথার ওপর ছাদ বলতে একজন অভিভাবক রূপে ধনবান পিতাও। তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ নিজের ফেলে আসা অতীতটাকে। কিন্তু আমি যা যা চেয়েছিলাম, তা তো এখনও পাইনি ডার্লিং।

যাও, এগিয়ে যাও, মনোগত ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণতি দাও গে, কে তোমায় বাধা দিচ্ছে? দয়া করে আমায় মুক্তি দাও। দ্রুত কণ্ঠে ইরা তার কথা শেষ করল।

–কিন্তু তুমি সঙ্গে না থাকলে যে আমার কোন ইচ্ছাই স্বার্থক রূপ পেতে পারেনা, বেবী। মধুর হাসি হেসে জবাব দিল এডরিস।

বহুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইরা। মনে মনে সে তার চিন্তার জাল গুটিয়ে ফেলল। সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, আমি এখন যাচ্ছি। তোমরা যদি আমার পথের

কোনরকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে উদ্যত হও, আমার হাতে ধরা জিনিসটা জানালা গলে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়বে সামনের ঐ রাস্তায়। কথাটা মনে রেখ।

–এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই ইরা। যাবার আগে আমার কয়েকটা কথা শুনে যাও।ইরা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

মিঃ ডেভনকে ভালোবাসতে শুরু করেছ, তাই না?

ইরা একটু ইতস্ততঃ করে পাল্টা প্রশ্ন করল : তোমার এ প্রশ্নের অর্থ?

–অর্থ তো খুবই পরিষ্কার। নিজের পিতৃদেবের তুলনায় এই নকল পিতা অনেক ভালো, চমৎকার মানুষ। তোমায় সুখী করার জন্য ভদ্রলোক তোমার জন্য কী না করেছেন। তাই তার মতো মানুষকে শ্রদ্ধা করা খুবই স্বাভাবিক।

এডরিসের বক্তব্য বুঝতে পেরে ইরা পাথরের মতো শক্ত কাঠ হয়ে গেল।

নিরীহ কণ্ঠে এডরিসইরার উদ্দেশ্যে বলছে:তোমার নিজের মাতাল পিতা একদিন যদি ব্যাঙ্কে হাজির হয়ে সকলের সামনে বিশেষ করে মিঃ ডেভনের সামনে তোমায় তার নিজের কন্যা বলে দাবী করে বসেন, সেদিন যেকাণ্ডটা ঘটবে তা ভাবতেই সারা শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। সবার কাছে এই সত্য প্রকাশ পেয়ে যাবে যে তুমি ডেভনের কন্যা কোনদিনই ছিলেনা,তার শ্যালিকা আর তুমি এই দীর্ঘ ছ সপ্তাহ ধরে তোমরা একত্রে একই গৃহে অবস্থান করছ, সারা শহরে এই মুখোরাচক ব্যাপার আলোড়ন তুলবে তোমাদের দুজনকে নিয়ে। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হবে বড়

করে...ফলাও করে খবরও প্রকাশিত হবে...সেইসঙ্গে তোমার দিদিমুরিয়েলেরঅতীত জীবনও সব অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে স্বচ্ছ দিনের আলোয়। এত কাণ্ডের পরেও কী তুমি আশা কর তোমার এই স্নেহপ্রবণ উদার-মনের পিতা সসম্মানে আর সমর্যাদায় আসীন থাকবেন তার ব্যাঙ্কের এই উচ্চতম পদের আসনে? তাই পা ফেলার আগে একবার অন্তত চিন্তা করে নিয়ে তবেই পা ফেলো, বেবীডল আমার।

ইরা যেন নিষ্প্রাণ এক পাথরের প্রতিমূর্তি।

এডরিস বলল, যাক, যা হবার ছিল তা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। ও নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার কোন কারণ নেই। যা বললাম সুবোধ বালিকার মতন আগামীকালই তার প্রমাণ দিও। কেমন? এবার তুমি আসতে পার।

ইরা চলে গেলে এডরিসফিলঅ্যালগিরের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, ওহে আমার গোঁয়ার গোবিন্দ! বন্দুকের গুলির চেয়ে কলমের খোঁচা আর ভায়োলেন্সেরচাইতে সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচই যে সব সময়ে শ্রেষ্ঠ তা মনে রেখ।

ইরা যখন জেমফারকে রিসিভ করতে মিয়ামি এয়ারপোর্টে পা রাখল তখন রাত সোয়া আটটা। এডরিসের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সর্বক্ষণ শুধু চিন্তাই করে গেছে কী ভাবে এই শয়তান দুটোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ডেভনের সঙ্গে মেয়ের অভিনয়ে অভিনয় করতে করতে কবে যে নিজের অজান্তেই এই দেড় মাসে সত্যি সত্যি তার মেয়ে বলে নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে, এতোদিনে এই সত্য তার অন্তরে উপলব্ধি করল। তার নিজের যা ক্ষতি হবার হোক কিন্তু দেবতাতুল্য অমন এক মানুষকে সে কখনোই পথের

ধুলোয় টেনে আনতে পারবেনা এবং যতক্ষণ বেঁচে আছে এই অন্যায় সে হতে দেবে না। তার একমাত্র ভরসাজেম। জেম বুদ্ধিমান, চতুর এবং সাহসীও। সবচেয়ে বড় কথা সে ফন্দিবাজ। জেম নিশ্চয়ই পারবে পাল্টা কোন মতলব এঁটে এই দুই শয়তানের শয়তানী মতলব বানচাল করে দিতে এবং তাদের হাত থেকে তাকেও নিষ্কৃতি দেবে। মিঃ ডেভনের সম্মান আর মর্যাদা নিজস্থানে অক্ষয় এবং অটুট থাকবে।

জেমকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন এয়ারপোর্টের বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে নিজের টি আর ফোর গাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল, গাড়ির মডেল দেখে জেমের চক্ষু ছানা বড়া।

সে জিজ্ঞাসা করলগাড়িটা কী তোমার নিজস্ব?

–অফকোর্স।

–হায় আল্লা! জোটালে কী ভাবে?

–জানবে, সবই জানবে। আগে তো গাড়িতে ওঠ।ইরা তাড়া লাগাল তাকে। জেমহতবুদ্ধির মতন গাড়িতে উঠে ইরার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ইরা। জেমের তখন কাহিল অবস্থা, এতো মূল্যবান গাড়ি...দামী পোশাক দামী মূল্যের প্রসাধনী সরঞ্জাম...এইসব কিছু এই দেড়-দু মাসের মধ্যে জোগাড় করল কী করে ঘুড়িটা।

শুধু কী তাই! আগে যার নুন আনতে পান্তা জোটানো ভার ছিল, সে এখন কিনা তাকে প্লেন ভাড়া...থাকার খরচ, পোশাক পরিচ্ছদ বাবদ নগদ পাঁচশ ডলার পাঠাচ্ছে। না, তার

সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একসময়ে সে জিজ্ঞাসা করল : আমায় নিয়ে কোথায় চলেছ বলো তো? তোমার বাসায়?

–স্বচক্ষেই দেখবে।

আর কোন প্রশ্ন করল না জেম।

ঘণ্টাখানেক পর ইরার গাড়ি এসে থামল সমুদ্রতীরের নিজস্ব অত্যাধুনিক কেবিনে। জনশূন্য আর অন্ধকারে ঢাকা এই সমুদ্রতীর।

দরজার তালা খুলে জেমকে নিয়ে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল ইরা, আলো জ্বালাল। পাইন কাঠের তৈরী চমৎকারভাবে সুসজ্জিত তিনকামরার সুন্দর কেবিন। পাশেই তিনটে পামগাছ। তার ছায়া এসে পড়েছে কেবিনে।

এখানে থাক? এটা তোমার? বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করে বসল জেম।

–না, এখানে থাকিনা। দিন কাটাই অন্য জায়গায়। সেখানে অবশ্য তোমাকে নিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। আর কেবিনটা আমার নিজস্ব সম্পত্তি না হলেও একরকম নিজেরই বলতে পার। ক্ষিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?

জেমের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ইরা তক্ষুনি রেফ্রিজারেটার খুলে কিছু ঠাণ্ডা খাদ্য বস্তু আর একবোতল বীয়ার বার করে জেম-এর সামনে রাখল।

জেম আর কোন কথা না বলে চটপট আহারে বসে গেল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আর ইরা তার সম্মুখপানে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরুকরল তার ঘটে যাওয়া অকথিত কাহিনী। গোড়া থেকেই শুরু করল, তবে টাকার আসল অংশটা শুধু উহ্য রেখে যা তার কাছে এডরিস কবুল করেছিল।

ভোজন সারতে সারতে জেম একমনে শুনে গেল ইরার কাহিনীর আদ্যপান্ত। একবারও কোন প্রশ্ন করলনা। ইরাকাহিনী শেষকরে বলল, এই হলো আমার এখানকার বর্তমানইতিহাস। প্রথমে এই কাজটা করার জন্য এক কথায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু এখন আমার এমন অবস্থা যে মন চাইলেও তাদের জাল ছিঁড়ে বেরতে পারছি না। এবার আমি কী করব অথবা এই পরিস্থিতিতে নিজেকে সামাল দেবার জন্য আমার কী করণীয় বলে দাও তুমি।

–এ কাজ থেকে কেন নিজেকে সরিয়ে আনতে চাইছ?

–ঐ টাকায় আমার আর কোন আসক্তি নেই। না চাইতেই অনেককিছু আমার ভাগ্যে জুটে গেছে। তাছাড়া আমার বিপদের কথাটাও একবার ভেবে দেখ। এভাবে চলতে থাকলে, একদিন না একদিন ধরা আমায় দিতেই হবে। তখন?

ওদের হয়ে কাজ করার জন্য কত টাকা ওরা তোমায় দিতে চেয়েছিল?

পাঁচহাজার ডলার। অম্লান বদনে মিথ্যে বলে গেল ইরা।

—এডরিস এতে কত কামাবে?

বিশ-ত্রিশ হাজার হবে, সঠিক বলতে পারছি না।

মাত্র? আমার তো মনে হয় ওরা তোমার কাছে আসল সত্য চেপে তোমায় বাজে কথা বলেছে।

বাজেই বলুক আরকাজেরই বলুক, তা আমি দেখতে চাইনা। আমি আর ঐচক্রে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাই না। একটা না একটা উপায় তুমি বার করো, জেম। যা ভুল করেছি আমার আর টাকার প্রয়োজন নেই। বিপদের ঝুঁকি অযথা আমি মাথায় নিতে চাই না।

জেম এবার একটা সিগারেট ধরাল। কয়েক মিনিট ধরে তাতে টানও দিল।নীরবে কিছু চিন্তা ভাবনা করে নিল। তারপর বলল, তোমার পক্ষে এই কাজ হাত ছাড়া করা বোধহয় বোকামিই করা হবে।

-কিন্তু আমার বিপদ?

বিপদ? কীসের বিপদ? ওরা তোমায় বিপদে ফেলবে? সে তো ওদের হয়ে কাজ না করলে। কিন্তু তুমি এই পনেরোটা দিন যদি মুখ বুজে কাজ করে যাও ওদের কথামতো, কাজের শেষে তখন পুরোপুরি পাঁচ হাজার পেয়ে যাবে। সেটা ভাবছনা কেন একবার?গত দেড় মাসে যদি কারো। চোখে কোন রকম কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনা থাক তবে এই পনেরো দিনেও কেউ তোমাকে। সন্দেহের বেড়াজালে জড়াতে পারবে না- যদি তুমি প্রতি পদক্ষেপ বুঝেশুনে সাবধানে ফেল।

ইরার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল প্রায়। একি শুনছে সে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। যার ওপর নির্ভর করেছিল, অগাধ বিশ্বাসে অকপটে তার কাছে স্বীকার করেছে, শেষে সেই কিনা তাকে এই বিপদের মুখেই ঠেলে দিচ্ছে?

তার দেহমন জেমের ওপর ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় রাগে ক্ষোভে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল : না, আমি পারব না তোমাদের আদর্শের পথে চলতে। অসম্ভব।

জেমের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চোয়াল কঠিন আকার ধারণ করল। এক পলকে নিষ্ঠুর জ্বর হয়ে গেল মুখের ভাব। সে দ্রুত বেগে ইরার সামনে এসে বিদ্যুৎগতিতে ডান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে তার গালে আঘাত হানল। আঘাতের ধাক্কা এতো প্রবল ছিল যে চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল ইরা।

কয়েক মিনিটের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল সে। সারা মাথা ঝিনঝিন্ করে উঠল। ইরা উঠে দাঁড়াবার বহু পূর্বেই জেম তার ওপরে কিল-চড়-লাথির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল।

ইরা অতিকষ্টে বলে উঠল : এখান থেকে বেরিয়ে যা রাস্তার নোংরা কুকুর কোথাকার! আমি তোর মুখ পর্যন্ত দেখতে চাই না।

দাঁড়া ছুড়ি এর মধ্যেই যাব কি? আগে আমার পেটের ক্ষুধা মেটাই–মন ভরুকপকেট ভরে উঠুক, তবে তো।কথা বলতে বলতে নিজের পোষাক ছাড়ল জেম। ইরাকেও নির্দেশ দিল তার এই পন্থা অবলম্বন করতে।

বেরিয়ে যা–বেরিয়ে যা বলছিআমি তোর কেনা বাঁদীনই যেকুম করলেই তা তামিল করতে হবে।

-বটে রে কুত্তা–এই বলেই সে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইরার ওপর। পূর্বের রণমূর্তি ধরে মারের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। মারের চোটে অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ল ইরা। বাধা দেবার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়েছে। এই অবসরকে কাজে লাগিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিল জেম। তারপর তাকে চিৎ করে ফেলে নিজেও শুয়ে পড়ল তার ওপর দেহের সব ভার চাপিয়ে। গোপনাঙ্গে তীক্ষ্ণ এক যন্ত্রণা অনুভব করল ইরা। এমন যন্ত্রণার স্বাদ এর আগেও তার ভাগ্যে জুটেছে। তখন সেই যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলেই মনে হয়নি। মনে হয়েছিল এর স্বাদ তীব্র মধুর। আজ সে যন্ত্রণায় ঝাঁকিয়ে উঠল। এই যন্ত্রণার ঢেউ তার সর্বশরীরে হলাহল বইয়ে দিল।

নিজের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়ে যখন জেম উঠে দাঁড়াল, ইরা তখন অঝোরে কেঁদে চলেছে। তার স্তনে, গালে, উরুতে জেমের পাশবিক অত্যাচারের নির্মম চিহ্ন অঙ্কিত।

পোশাক গায়ে চড়াতে চড়াতে অবশ হয়ে পড়ে থাকা ইরার শরীরে পা দিয়ে একটা মৃদু টোকা দিয়ে জেম বলে উঠল,তোর হাত ব্যাগে যা মালকড়ি আছে আমার হাত খরচের জন্য নিয়ে নিলাম। তুই আবারও পেয়ে যাবি, পরে কিন্তু আমায় দেবার কেউ থাকবে না। সোলং বেবী।

ইরা হতাশায় বেদনায়, অপমানে জর্জরিত হয়ে সেই শূন্য ঘরে একাকী চোখের জল ফেলতে লাগল।

জেম কোথাও যায়নি কাছাকাছির মধ্যেই নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। আর সেই গোপনীয় স্থান থেকেই কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখল ইরাকে। ইরার সমস্ত গতিবিধি সে লক্ষ্য করছিল। কেবিনের দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা কোথায় রাখল ইরা, তাও সে দেখে রাখল। ইরা চলে যাবার পর ধীরেসুস্থে সে তার পূর্বের আশ্রয় নেওয়া স্থান থেকে বেরিয়ে এসে, তালা খুলে কেবিনে প্রবেশ করল। রাত্রে থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

জেম এবার গোটা কেবিনটা মনের সুখে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে লাগল। দেখা শেষ হলে সে পা রাখল শয়নকক্ষে। সু-সজ্জিত আরামপ্রদ আর বিলাসবহুল নিজ শয্যা পাতা। জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিকালীন পোশাকের জন্য ক্লোজেট হাতড়াল। পোশাক আসাক যা আছে সবই বেশ মূল্যবান তবে তার খর্ব আকৃতির তুলনায় একটু বেশী বড়। জেম অতঃপর একটা চেস্ট অব ড্রয়ার্স খুলল।

ড্রয়ারে থরে থরে রাখা আছে সার্ট, রুমাল, টাই, মোজা এইসব। উল্টেপাল্টে একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিল। শেষ ড্রয়ারটা টানতেই তার সমস্ত শরীর টান টান হয়ে গেল। একগাদা তোয়ালের ওপরেই একটা পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের অটোমেটিক কোল্ট রিভলবার আছে। বহুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকার পর কিছুটা উত্তেজনা আর কৌতূহলের বশেই সে তুলে নিল নিজের মুষ্টিতে।

মোকাসিন গ্যাং-এর মুখ্য ভূমিকা পাবার পর থেকেই এমনই এক প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব বোধ করছিল জেম। নিজের করে একটা রিভলবার পাবার বাসনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার বহুদিনের কিন্তু অর্থ আর সুযোগের অভাবে এতকাল তা বাস্তবে

রূপায়িত হয়নি। আজ সেটা পরিপূর্ণতা লাভের মুখে এসে পৌঁছেছে। রিভলবারটা সঙ্গে নিয়েই সে বিছানায় বসল। মুখে পূর্বের সেই কুটিল হাসি। আর কেইরার দয়ার দানের পরোয়া করে? এখন তার হাতে এমন এক হাতিয়ার এসে গেছে যার দ্বারা সে নিজেই কেড়ে নিতে পারবে বহুজনের কাঙ্ক্ষিত পার্থিব বহু কিছু।

নিজের বোনা স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিভলবারটা হাতে নিয়ে টান টান হয়ে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিল। আবেশে দুচোখে নেমে এল তৃপ্তির নিদ্রা।

চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে বিনিদ্র ভাবে কেটে গেল ইরার গোটা রাত। একটা চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তা হল: জেমের মতলবটা কী?তার হাবভাব দেখে মনে হয় সে আর ব্রুকলিনে ফিরে যাচ্ছে না। কেন যে সব কথা জেমকে খুলে বলার মতো বোকামী করে বসল ইরা! এখন সে নিরুপায়, সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়েছে ঐ পশুটার কাছে। ঐ জঘন্য ইতর নর পশুটাকে সে যে কোনদিন মন দিয়েছিল, একথা মনে হতেই তার সারা মন ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠল। জেমের চিন্তা মন থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিল। এডরিসের কথা ভাবতেই তার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল ইরা। এই লোকটা তার জীবনের সকল সমস্যার মূলে, তারও কোন সমাধান খুঁজে পেল না সে। কোথাও যে পালিয়ে গিয়ে একটু পরিত্রাণ পাবে, সে পথও আজ। রুদ্ধ। মেল নিরুপায় হয়েই পুলিশকে সজাগ করে দেবেন। ফলস্বরূপ পুলিশের জালে ধরা পড়ার পর তার যাবতীয় কীর্তি কাহিনী অচিরে ফাঁস হয়ে পড়বে জনমানসে। নিশ্চিত ভরাডুবি।

এভাবেই রাত পার হয়ে কখন যে দিনের আলো ফুটল ইরা টেরও পেল না। সকালে উঠে দেখা হলো মেলের সঙ্গে–ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

মেল ইরার ক্লিষ্ট মুখপানে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কী শরীর ভালো নেই, নোরেনা?

–না, না, তেমন কিছুনা, জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে জবাব দিল ইরা।

তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল : কী বলল জয়? বিবাহে তার মত আছে?

মেল একগাল হেসে জবাব দিলেন : হ্যাঁ, এ মাসের শেষাশেষি। আমার হাতে কাজের চাপও অনেক কম থাকবে। নিশ্চিন্তে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যেতে পারব। আশা রাখি, কিছুদিনের জন্য তোমায় একা থাকতে হবে বলে তুমি মনে কিছু করবে না।

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা ইরার মাথায় খেলে গেল। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে তার এখান থেকে পালিয়ে যাবার চমৎকার এক সুবর্ণ সুযোগ। মেল হনিমুনে চলে গেলে সেও এখানকার হাউসকীপার মিসেস স্টার্লিংকে বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিঐ ধরণের একটা বাহানা দিয়ে নির্বিঘ্নে এই শহর ছেড়ে সরে পড়বে। অবশ্য কোথায় আর কতদূরে গিয়ে তার এই যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তার কোন ধরণা নেই।

ইরা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল : না না, মনে করব কেন? ঐ কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তবে, আমার অগ্রিম বেস্ট উইসেস জানিয়ে দিলাম। কাপের তলানি কফিটুকু সমাপ্ত করে উঠে পড়ল ইরা।

আমি উঠছি ড্যাডি। কাজের একটু তাড়া আছে।বলে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘড়িতে এগারোটা হবে, জনৈক দীর্ঘাঙ্গিনী, সুসজ্জিতা সুরূপা এক ভদ্রমহিলার প্রবেশ ঘটল লকাররুমে। নাম মিসেস মেরী গ্যারল্যান্ড। স্টীল ম্যাগনেট ধনকুবের মিঃ মার্ক গ্যারল্যান্ডের স্ত্রী। তিনি ও তার স্বামী ঐদিন সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করছেন। গতরাতে ক্যাসিনোয় জুয়ায় মোটা অঙ্কের বাজী জিতেছেন। সেই টাকাই বোধহয় সেফে রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এখানে হাজির। হয়েছেন। চীফগার্ড সেই রকমই একটা পূর্বাভাস দিল ইরাকে।

ভদ্রমহিলা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ইরার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ইরা সস্মিত মুখে বলল, গুডমর্নিং মিসেস গ্যারল্যান্ড, আমি নোরেনা ডেভন। আশা করি, সব কুশল মঙ্গল।

–গুডমর্নিং? তুমি মেল-এর মেয়ে? তোমার অনেক কথা শুনেছি মেল-এর কাছে। তোমার মাকেও চিনতাম। অবিকল তারই মতো রূপের অধিকারিনী তুমি। তবে আমার মনে হয় তোমার মার থেকেও সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে তোমার পাল্লাই একটু ভারী–মুহূর্তের জন্য একটুথামলেন, তারপর গলার স্বর কমিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : শুনলাম মেল নাকি আবার বিবাহ করছে? তুমি এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ জানাওনি?

–ঠিকই শুনেছেন। আমার আপত্তি জানাবার কী আছে? বাবার সুখেই আমি সুখী।

-বাঃ বাঃ, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। তা তুমি তোমার নতুন মা, জয় অ্যানলিকে দেখেছ কখনো? আলাপ হয়েছে?

-হ্যাঁ, সত্যি চমৎকার মানুষ।

–তোমার কথাই ঠিক। আমার সঙ্গেও আলাপ আছে। বড় ভালো মেয়ে।

তারপর মিসেস গ্যারল্যান্ড তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা পেটমোটা খাম আর নিজের চাবিটা বার করে ইরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, মনে যদি কিছু না করো, নোরেনা সেটা খুলে এটা রেখে দাও না লক্ষ্মীটি। আমি এখানেই বসে আছি।

ইরার বুকের রক্ত এই কথায় চলকে উঠল। সে দ্রুত অনেক কিছু তার মনে ছক করে নিল। তারপর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে নিজের টেবিলের ড্রয়ার খুলে পাস কী বার করার সঙ্গে একটুকরো পুটিও পুরে ফেলল তালুতে। এরপর ধীর পদব্রজে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলল মিসেস গ্যারল্যান্ডের সেফ যেখানে–অর্থাৎ সেইদিকে।

সেফ খুলতেই ইরার দৃষ্টি অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখল : টাকার মোটা মোটা বান্ডিল আর পেটমোটা খাম থরে থরে সজ্জিত আছে তাতে। সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটি জুয়েল বক্স। গহনার বাক্সে যে দামী মূল্যের গহনা আছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তার একবার মনেও হল কী প্রয়োজন আর চাবির ছাপ নেওয়ার? একটা কী দুটো পেট মোটা খাম, কি টাকার বান্ডিল আলগোছে তুলে নিয়ে সযত্নে প্যান্টির মধ্যে চালান করে দিলেই কোন ঝাট নেই। পরক্ষণেই ভাবল : না, অতসহজে ওদের সুবিধে করে দেবে না। চাবির ছাপ দেবে...সেই ছাপ থেকে পরিশ্রম করে চাবি

তৈরী করুক, তারপর সোমবার ব্যাঙ্ক খুললে ঐ চাবির সদ্ব্যবহার করে ফেলুক। তার আগে কখনোই নয়।

এই ভেবে সে খামটা রেখে সে বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়ল, কিছুটা দূরে মিসেস গ্যারল্যান্ড তার কার্যবিধি লক্ষ্য করছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ইরার। বরাত জোরে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস সে খাম বা টাকা কোনটাই নেওয়ার সাহস করেনি সে থেকে। না হলে আজ যে তার ভাগ্যে কী ছিল...

লাঞ্চ হলে রাস্তার ওপারে কাফেতে গিয়ে অধীর প্রতীক্ষারত অ্যালগিরের হাতে চাবির ছাপটা তুলে দিল ইরা।

–মাত্র একটাই, গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ফিল।

–হ্যাঁ, আজ একজনেরই পদধূলি পড়েছিল ভল্টে।

কে?

–মিসেস মেরী গ্যারল্যান্ড। নিউইয়র্কের কোটিপতি ব্যাবসাদার মিঃ পার্ক গ্যারল্যান্ডের স্ত্রী।

কোটিপতি যখন বলছ তখন সেফের মধ্যে যৎপরন্যাস্তি মালকড়ি আছে নিশ্চয়ই।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

-হুম। আশা করি আমায় দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য করবেনা যে, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমাদের অযথা বোকা বানাবার শাস্তি কী হতে পারে? ঈশ্বরের তোমার প্রতি অনেক করুণা যে একবার বেঁচে গেছ বলে বার বার সে সুযোগের সম্মুখীন তুমি হবে না, বেবী।

ইরা কোন কথা না বলে শুধু ঘৃণা জনিত দৃষ্টিতে একবার ফিলের দিকে চেয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরে ফিরে এল ফিল। নিজের নিজের ভাবনাচিন্তার বেড়াজালে বিচরণ করার দরুণ দুজনের একজনও লক্ষ্য করলনা যে রাস্তার একধারে একটা ভাড়াকরা পুরোন গাড়ির মধ্যে থেকে হেস সন্দিহান দৃষ্টিতে এদিকেই তাকিয়ে। পুলিশের চাকুরিতে রহস্য-রোমাঞ্চ যতই অফুরন্ত থাক, ছুটি কিন্তু মোটে পাওয়া যায় না। নিয়মিত ডিউটি ছাড়া, ডাক এলেই সময় অসময় বিচার না করে ছুটতে হবে কর্মক্ষেত্রে। তাই আচমকা এই সপ্তাহে উইক এন্ডে ছুটি পেয়ে হেস মহাখুশী। ছেলে আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিকনিকের উদ্দেশ্যে প্যারাডাইসসিটি আর মিয়ামির মাঝে যে একটি মাত্র পিকনিক স্পট সমুদ্রের একেবারে ধারে, ঠিক সেই জায়গাতে।

সূর্যের তাপে মনোরম উষ্ণতা..মৃদুমন্দ হাওয়ায় অপরূপ আমেজ সমুদ্র কল্লোলে ঘুম পাড়ানীয়া গানের সুন্দর সুর। একপেট মুখোরোচক পিকনিক লাঞ্চ সেরে, একটা সুন্দর জায়গার সন্ধান পেয়ে হেস পরম নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিলেন, কিছু দূরে বসে স্ত্রী মারিয়া তার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, আর একটু তফাতে ছেলে জুনিয়ার বালি নিয়ে খেলায় মত্ত।

চিত হয়ে কুপোকাত হয়ে দুহাত ভাঁজ করেমস্তকের নীচে দিয়ে, চোখ বুজে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছেন হেস। চোখে ঘুম নেমে এসেছে, ঠিক এই সময়ে তার ঘোর কেটে গেল আট বছরের ছেলে জুনিয়ারের তীব্র মন্তব্যে।

–মাম্মী! আমি পপকে কবর দেব।

এই বাণী কানে যাওয়া মাত্রই ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। মনে মনে বিরক্ত হলেন জুনিয়ারের ওপর। সত্যি বড় আবদার করে আজকাল। উচিত-অনুচিত যা জেদ ধরছে তা করা চাই-ই। ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মারিয়াই ওর মাথা খেয়েছে। আজকের এই অবস্থার জন্য মারিয়া সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

হেস স্ত্রীকে ডেকে বললেন, জুনিয়ারকে তোমার কাছে ডেকে নাও, মারিয়া। আমায় একটা দিন অন্তত আরাম করতে দাও।

কথাটা শোনামাত্র যা দেরী ছিল, এক ঝংকার দিয়ে উঠল মারিয়া : তুমি আরাম করছ কর না। ও বড় জোর দু চার মুঠো বালি তোমার গায়ে ছড়িয়ে দেবে, তাতে কী তুমি ক্ষয়ে যাবে নাকি?

মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন হেস। মায়ের আদর সোহাগের স্রোতে ভেসে গিয়ে ছেলে তখন তার বেলচাটা হাতে নিয়ে মহানন্দে লাফাচ্ছে। হঠাৎ একটা চমৎকার মতলব ঘুরপাক খেয়ে গেল হেসের মগজে। তিনি জানতেন তার ছেলেকে কোন কৌশলে বশীভূত করা যায়। ব্যাপারটা তেমন জটিল নয়, জুনিয়ারের মনকে অধিকতর আকর্ষক কোন কিছুর দিকে প্রভাবিত করতে পারলেই তখনকার মতো নিশ্চিন্ত। সেই উপায়ই

তিনি কাজে লাগালেন। কোমল কণ্ঠে কাছে ডাকলেন জুনিয়ারকে। জুনিয়ার এলে, হেস রহস্য রোমাঞ্চ কোন কথা তার কাছে উত্থাপন করতে চলেছেন ঠিক এমনভাবে মুখের ভাব তৈরী করে বললেন, আমার একটা কথা শুনবে জুনিয়ার?

-কী?

অনতিদূরের একটা বড়গোছের বালিয়াড়ির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে হেস বললেন, ঐ যে বড় বালিয়াড়ি দেখতে পাচ্ছ, ওখানে গতকাল রাতে অভিনব এক কাণ্ড ঘটে গেছে। তুমি যদি কাউকে না বল–এমনকি তোমার মাকেও, তবে আমি তোমায় বলতে পারি।

শিশু মাত্রই অজানা, অচেনা অজ্ঞাত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অপরিসীম। অপরিমেয় কৌতূহল। তার ওপর জুনিয়ারের পরিচয় সে একজন গোয়েন্দার ছেলে। স্বাভাবিক কারণেই বাবার প্রস্তাব উৎসাহিত হয়ে সে লুফে নিল। বলল, না, কাউকে বলবো না, প্রমিস।

ছেলেকে কোলে বসিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে,কণ্ঠস্বর কোমল করে হেস বলে উঠলেন, কাল রাতে এক বৃদ্ধ মাংসের বড়া ফেরি করে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিতে ওখানে এসেছিল। যখন সে গভীর নিদ্রায় ডুবে আছে তখন হঠাৎ ভীষণ ঝড় ওঠে সমুদ্রের দিক থেকে। তার ফলে ঐ বালিয়াড়ির বালি আর আশে-পাশের বালি উড়ে গিয়ে, বড়ার ঝুড়ি সমেত চাপা দিয়ে দেয় বৃদ্ধকে। তুমি যদি তোমার বুদ্ধির বলে ঐ বালিয়াড়িতে গিয়ে ওর ডালাটার কোন কিনারা করতে পার তবে লাভবান হবে তুমি।

বৃদ্ধ জেগে উঠে খুশীতে ডগমগ হয়ে তোমার হাতে বেশ কয়েকটা বড়া উপহার স্বরূপ তুলে দেবে, তুমিও বড়া খেতে পারবে।

–সত্যি বলছ?

–অকাট্য সত্যি।

জুনিয়ার একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বালিয়াড়ির দিকে তারপর ফিরে তাকাল তার বাবার মুখের দিকে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে এটাই বুঝতে চাইল যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বাবা তাকে বোকা বানাচ্ছেন না তো?

তাই সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, তুমিও আমার সঙ্গে চলনা, পপ। আমার হাতে হাতে একটু সাহায্য করবে।

-বেশ তো চল, তবে তুমি তো জান, তোমার সঙ্গে বালি খুঁড়তে আমিও হাত লাগালে বৃদ্ধ খুশী হয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কিছু বড়া খেতে দেবে–তাতে তোমার ভাগে কম হয়ে গেলে কোন আপত্তি নেই তো? তোমার যদি আমাকে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা না থেকে থাকে চল। আমি এক পায়ে খাড়া।

মাংসের বড়ার প্রতি জুনিয়ারের অস্বাভাবিক দুর্বলতার কথা তার অজানা নয়। তাই বালি খুঁড়ে বৃদ্ধ ফেরিওয়ালার সন্ধান করে পুরস্কার হিসেবে যে ভাগ্যে বড়া জুটবে–তার থেকে বাবাকে ভাগ দেবার ব্যাপার উঠতেই রীতিমত দমে গেল জুনিয়ার। তাই বাবার কথায় মাথা নেড়ে বলে উঠল, তবে থাক, আমি একাই বালি খুঁড়ে বৃদ্ধকে সামনে আনবার

ক্ষমতা রাখি। এই বলে সে ক্ষুদে বেলচাখানা কাঁধে তুলে নিয়ে এক ছুটে এগিয়ে চলল সেই বালিয়াড়ির দিকে।

মারিয়া এতক্ষণ ধরে বাবা আর ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কোন কথা না বলে সে চুপচাপই তার কাজ করে যাচ্ছিল। ছেলে তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতেই স্বামীর দিকে তাকিয়ে স্থুল মন্তব্য না করে পারল না। সে বলল : নিজের ছেলের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করতে তোমার একটুও লজ্জা করে না, হেস?

হেস কোন জবাব না দিয়ে সহাস্যে পুনরায় আড় হয়ে গেলেন বালির ওপর। দেখতে লাগলেন তাঁর ছেলে অনাবিল উৎসাহের সঙ্গে সেই বালিয়াড়ির তলায় বালি খুঁড়ে চলেছে প্রাণপণে। মিনিট কুড়ি পর–হঠাৎ জুনিয়ারের আর্তচীৎকারে স্বামী স্ত্রী উভয়েই চমকে ওঠেন।

তিনি দেখলেন তাদের ছেলে অস্থিরভাবে লাফালাফি করছে তার খোঁড়া জায়গাটা ঘেঁষে আর দুহাত নেড়ে ডাকছে তার বাবাকে।

–পপ। শীগগীর এসো। দেখে যাও, বৃদ্ধকে নয় তার জায়গায় অন্য এক আগন্তুককে এই বালি খুঁড়ে বার করেছি।

৭-৮. পুলিশ আর গোয়েন্দা

০৭.

পুলিশ আর গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে ঘটনাস্থল। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের লোকেরা খুব সতর্কতার সঙ্গে আর সযত্নে নিজের নিজের কাজ বহাল তবিয়তে করে যাচ্ছে জুনিয়ার হেসের বালি খুঁড়ে পাওয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত মৃতদেহকে কেন্দ্র করে। ডাক্তার লোইসও পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন তার ডাক্তারি সাজ সরঞ্জাম নিয়ে। মিঃ টেরেল, বেইগলার আর হেস একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন তার অভিনব কর্মপ্রণালী।

একসময়ে বেইগলার, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টেরলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, মৃত মেয়েটির মুখের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ওকে সনাক্ত করা একটু কঠিন তো হবে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থা দেখে যা মনে হচ্ছে, হয় খুনি ওর সমস্ত পোশাক-আসাক সঙ্গে নিয়ে গেছে। আবার এও হতে পারে কোথাও পুঁতে ফেলেছে যাতে না সহজে ওর সনাক্তকরণ কোনভাবে সম্ভব হতে পারে।

–হুম! আপাততঃ রিপোর্ট শোনা যাক। তারপর হেড কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে, আগামীকালের সংবাদপত্র, রেডিও আর টিভিতে এই মেয়েটির একটা সাধারণগোছের বর্ণনা দিয়ে খবর প্রচারের সমস্ত দায়িত্ব আমি তোর্মর জিম্মায় সঁপে দিলাম, জো।

-ও, চীফ। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেইগলার বলে উঠলেন, সমুদ্রের এই উত্তাল হাওয়ায় আশেপাশে যে রকম বালি উড়ছে তাতে কোন পদচিহ্ন পাওয়ার আশা একেবারেই বৃথা। খুনী লাশ গুম করার অভিপ্রায়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই আসরে নেমেছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মোটরে চেপেই এসেছিল।

সে চায়নি যে মেয়েটার পরিচয় সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাক, তাই চলে যাবার সময়ে তার শিকারকে সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রহীন করেই রেখে গিয়েছিল। বোধহয় তার মনে শঙ্কা ছিল যে, মেয়েটার পরিচয় প্রকাশ পেলে সেও আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবেনা পুলিশের। তার মানে শিকার আর শিকারী দুজনেই দুজনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল।

টেরেল এবং হেস উভয়েই বেইগলারের যুক্তিকে সমর্থন করল।

ইতিমধ্যে নিজের কাজ সেরে ডাক্তার লোইস এসে যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে। মিঃ টেরেল, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে ডাক্তার জানালেন : মার্ডার...জোর জুলুম করে শ্বাস রোধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। দেড়মাসের আগের ঘটনা। মুখের যেটুকু অংশ এখানে আবিষ্কৃত তাতে আঘাত ও কালশিরার দাগই বেশী। তার মানে মেয়েটাকে খুব সহজে বশীভূত করা যায়নি। মেয়েটি সম্পর্কে যাবতীয় ডিটেস্ দিতে পারব ডেডবডি মর্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষার পর পরই।

মেয়েটি কী ধর্ষিতা হয়েছিল?

–না।

ডাক্তারের জবাব শুনে তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। তার মানে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে অন্য কারণ আছে। লালসার বলি সে হয়নি।

বয়স কত হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

–১৭ থেকে ১৯ এর মাঝামাঝি।

–শরীরের কোথাও কোন আইডেন্টিফাইং মার্কস আপনার চোখে পড়েছে?

—না।

–মেয়েটি কী ন্যাচারলি ব্লন্ড? না, রঙ করা চুল?

–ন্যাচারলি ব্লন্ড।

–ভার্জিন? না কি পুরুষ সংসর্গে কখনো জড়িয়ে ছিল?

–না, ভার্জিন। আর কোন প্রশ্ন আছে?

আপাততঃ নয়। আপনি কাইন্ডলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেবেন আমাকে।

-ও-কে। চলে গেলেন ডাক্তার তার নিজের মোটরের দিকে।

টেরেল বললেন,শোন জো, তুমিও তোমার কাজে নেমে পড়। মিয়ামি পুলিশের কাছে খোঁজ খবর নাও, দেড় মাস পূর্বে তাদের কাছে কেউ এই বয়সের কোন মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট দায়ের করেছে কি না।

তেমন কোন সংবাদ যদি না থেকে থাকে তবে আরো অনেক দূর আমাদের জাল বিছোতে হবে। এই ঘটনা তার সমক্ষে যত পাবলিসিটি সংগ্রহ করতে পারবে ততই আমাদের কাজে আরো সুবিধা হবে এই মৃতা মেয়েটির সনাক্তকরণে।

বেইগলার চলে গেলেন। এগিয়ে এলেন হেস। তবে একটা কথা চীফ।

—বলো।

–জায়গাটার আশেপাশে পরীক্ষা করে আমার মনে হচ্ছে-খুন এখানে হয়নি। কাউকে নাকে-মুখে আঘাত করে, শ্বাস রোধ করে মারতে উদ্যত হলে কিছু না কিছু রক্তক্ষরণ হবেই। কিন্তু রক্তপাতের এখানে কোন চিহ্নমাত্র নেই। আমাদের ঐ সমস্ত গাছপালায় পরিবেষ্টিত জায়গার অনুসন্ধান করতে হবে।

–ঠিক আছে ফ্রেড, আমি ফিরে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে কথা বলে, তাদের যে জোরালো আর্ক ল্যাম্প আছে তা পাঠাবার না হয় ব্যবস্থা করছি। তুমি পুরোদমে তোমার কাজ চালিয়ে যাও।

রাত, তখন নটা বেজে গেছে। ডিটেকটিভ রুমে বসে বেইগলার, লেপস্কি আর জ্যাকবির সঙ্গে আজকের ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করছিলেন টেরেল, এমন সময়ে ঘরে পা

রাখলেন। হেস। ক্লান্ত চোখে মুখে খুশির ছাপ তখন স্পষ্ট। তিনি টেবিলের ওপর একটা হাল্কা নীলরঙের প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা আর একটি কাগজের মোড় রাখলেন। চশমাটির ডানদিকের পরকলা বেপাত্তা আর বাঁদিকের পরকলাটি চিড় খাওয়া।

হেস বললেন, মেয়েটাকে কোথায় মারা হয় তার সন্ধান আমি পেয়েছি চী। যেখানে সে মৃতা অবস্থায় পড়েছিল তার থেকে ফুট তিনেক ব্যবধানে এটা আমি উদ্ধার করেছি। রক্তের সন্ধানও মিলেছে। আর সেইসঙ্গে পেয়েছি খুনীর জুতোর দাগ। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে ছাঁচ তোলারও ব্যবস্থা করে এসেছি জ্যাকের মাধ্যমে।

টেরেল নিবিষ্ট মনে উল্টে পাল্টে দেখছিলেন সেই ভঙ্গুর চশমা আর তার পরকলারটিকে। বললেন, টম! এই চশমা আর পরকলাটা নিয়ে পুলিশ ল্যাব-এ যাও। আমার মন বলছে এর লেন্স কোন সাধারণ লেন্স নয়। এর মধ্যে কোথাও একটা বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে। তারপর ফ্রেম থেকে যতটা সংবাদ যা পাওয়া যায়।

–ওকে চীফ। চশমা আর পরকলাটা নিয়ে লেপস্কি চলে গেলেন।

.

০৮.

এডরিসের ঘুম যখন ভাঙল সকাল তখন সাড়ে আটটা।শয়নকক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছিল ফিল এর সুগভীর নাসিকা গর্জন। বসবার ঘরে সোফাকাম-বেড এ পড়ে পড়ে গভীর

ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। মিসেস গ্যারল্যান্ডের চাবির ছাপ নিয়ে কাল গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাকে।

চাবিটার কথা মনে উদয় হতেই এডরিসের সারা দেহ মন চনমন করে উঠল। কাল রাত্রে লা কোকাইল রেস্তোরাঁয় মিঃ গ্যারল্যান্ডের বন্ধু বান্ধবদের এই কথা বলতে সে.শুনেছে: গ্যারল্যান্ড নাকি আগের দিন রাত্রে ক্যাসিনোয় গিয়ে জুয়া খেলে বেশ মোটা মূল্যের দাও মেরেছেন লাখখানেক ডলারের কম তো নয়ই।

কাজেই মিসেস গ্যারল্যান্ড যদি ইরার হাত দিয়ে তার অর্ধেকও ব্যাঙ্কে জমা রাখেন এত ঝুঁকি নেওয়া তবেই সার্থক।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল এডরিস। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে, দাঁড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, পোশাক পাল্টে সদর দরজা খুলে সেদিনের সংবাদপত্র আর দুধের বোতল সংগ্রহ করল, তখন ঠিক নটা। ততক্ষণে ফিলের ঘুম ভেঙেছে।

তাকে উঠতে দেখে এডরিস কিচেনে গিয়ে সুইচ অন করে পার্কোলেটারে প্লাগ দিয়ে দুজনের মতো কফির জল বসিয়ে দিল পটে। নিজস্ব কৃতিত্বে হাতের এক ঝটকায় খুলে ফেলল খবরের কাগজের ভাঁজ। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছানাবড়া হয়ে হতবাক মুখ হাঁ হয়ে গেল তার। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল আপনা থেকে। বুকের মধ্যে কেউ যেন দুরমুশ পেটাতে লাগল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছবি সমেত বড় বড় হরফে ব্যানার লাইনে লেখা রয়েছে : কোরাভ কোভ-এ জনৈকা অজ্ঞাত পরিচয় তরুণীর মৃতদেহ আবিষ্কার।

শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু!

নীচে ছোট ছোট অক্ষরে সংবাদদাতার রিপোর্ট।

রিপোর্টটা একবার নয়, দুবার-তিনবার এক নাগাড়ে পড়ে গেল এডরিস। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক লহমায় তাকাল ছাপা ছবিখানার দিকে বিশেষ করে জুনিয়ার হেসের ছবিটার দিকে। তারপর পার্কোলেটারের সুইচ অফ করে, গুরু গম্ভীর মুখে হাজির হলো বসার কক্ষে। তার চোখ মুখের ভাবগতিক দেখে ফিল একটু ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল : কী ব্যাপার?

এডরিস প্রত্যুত্তরে সকালের সংবাদপত্রটা বাড়িয়ে ধরল তার মুখের সামনে–নিজেই পড়ে চক্ষু সার্থক কর।

কাগজের বড় বড় অক্ষরের হেডলাইন দেখে সেও চমকে উঠল। তারপর রিপোর্ট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে একেবারে বিবর্ণ রূপ ধারণ করল।

–জুডাস! ওরা ওর সন্ধান পেয়ে গেছে তাহলে! কিন্তু আমি তো ভালোভাবেই তাকে কবর দিয়েছিলাম।

–তোমার ভালোভাবের নিকুচি করেছে অপদার্থ কোথাকার! খেঁকিয়ে উঠল এডরিস, এমনই নিখুঁতভাবে পুঁতেছিলে যে, আটবছর বয়সী একটা বাচ্চা ছেলেরও সেটা খুঁজে বার করতে কোন বেগ পেতে হয়নি। আমার কী ইচ্ছা করছে জান? ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে তোমায় গুলি করে মারতে। আমাদের এতোদিনের স্বপ্নটাকে তুমি তোমার অপদার্থতা আর অযোগ্যতার দরুণ ভেঙে চুরমার করে দিলে। তোমার ওপর দায়িত্ব না দিয়ে যদি

নিজে হাতেই কাজটা করতাম, আজকে আর এই দুর্দিনের মুখোমুখি হতে হতো না। আফসোস আর নিরাশায় এডরিসের কণ্ঠ শেষ দিকে একেবারে বুজে এল।

এক পেগ হুইস্কি পেটে পড়তেই কিছুটা সামলে নিল পরিস্থিতিকে এডরিস। সে আর একবার কাগজের রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে, কিছুটা আশাব্যঞ্জক সুরে সুর মিলিয়ে ফিলকে বলল, দেখ ফিল, খবরের কাগজে লিখছে–এখনও ওর সম্বন্ধে কোন তথ্য পুলিশের হাতে এসে পৌঁছয়নি। শুধু তাই নয় খুনীর কোন কুও পায়নি। তাই ইরা যতদিন তার অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবে, ততদিন পুলিশ কেমনকরে আন্দাজ করবে যেলাশ আসলে নোরেনার?আমরা এখনও পর্যন্ত তেমন কোন বিপদের সম্মুখীন হইনি। আমরা আমাদের পূর্ব ছকে কাজ চালিয়ে যাব। ছবিটা ভালো করে একবার লক্ষ্য করো ফিল, মুখের অর্ধেক পোকার গহ্বরে চলে গেছে আর অবশিষ্ট অংশটা গলে পচে বিকৃত অবস্থা। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা নিরাপদ। ঐ ছবি দেখে ওর প্রকৃত পরিচয় খুঁজে বার করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

–কিন্তু যতোই সান্ত্বনা দাও টিকি, আমার বুকের ধুকধুকুনি এখনও পূর্বের মতোই সচল। তোমার চাইতে পুলিশকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। তাই তাদের চেনার অভিজ্ঞতা আমার একটু বেশী বলতে পার। তারা প্রেস রিপোর্টারকে যতোটা বলে, ঠিক ততটাই আবার চেপে রাখে সযত্নে নিজেদের অন্তরে। কে বলতে পারে, এখানেও হয়তো সেই কৌশলটা কাজে লাগিয়েছে কিনা? তোমার সঙ্গে এই কাজে যুক্ত হয়ে ভাগে যে বিশ হাজার ডলার আমার মুঠিতে এসেছে তাই যথেষ্ট। এদেশে থাকার কোন প্রবণতা আমার আর নেই। আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটেই কিউবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

ফিলের কথা শুনে এডরিস ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেল। কেননা সে চলে গেলে চাবির ডুপ্লিকেট তৈরী করতে কে আর এগিয়ে আসবে? একাজে ফিলের অবদান ইরার চেয়ে কিছু কম নয়। তাই মনের ভাব মনেই চেপে এডরিস মুখে শুধু বলল, আজ বিকেলেই চলে যেতে চাও?

আগামীকাল গ্যারল্যান্ডের ভল্ট খুলে টাকার ভাগ না নিয়েই চলে যেতে চাও? জান কত টাকা মজুত আছে ঐ সেফে? এক লাখ ডলার!

গ্যারল্যান্ডের বন্ধুবান্ধবের মুখ থেকে আমার নিজের কানে শোনা! এতটুকু মিথ্যে নয়। সেই টাকার প্রাপ্য ভাগ তুমি না নিয়েই চলে যেতে চাইছ? তোমার পকেটের ঐ বিশ হাজার ডলার আর কতদিন চলবে? সারাজীবন ধরে চলবে কী ওতে?

সোফার ওপর এবার নড়ে চড়ে বসল ফিল। এডরিস এটা বেশ সহজেই বুঝে নিল যে : মাছ অবশেষে টোপ গিলেছে। কিন্তু ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার সময় এবার উপস্থিত। যখন একবার ওর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে, তখন ভয় পেয়ে ভুল পদক্ষেপ ফেলে অনেক কিছু অঘটনই ঘটে যেতে পারে। আগে ভাগে টাকাটা একবার বার করিয়ে নিই গ্যারল্যান্ডের সেফ থেকে, তারপর ওর ভাগ্যে যা লেখা আছে তার শেষ রফা আমি করে দেব, তা হলো-রিভলবারের একটি কি দুটি গুলি। মনে মনে সেরকমই একটা ফন্দি আঁটল এডরিস।

রবিবার। ছুটির এই দিনটি কারো কাছে কেটে যায় স্রোতের মতো, আবার কারো কাছে ঐ দিনটি কাটানো যেন দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে–এমনই শামুকের মতো গুটিগুটি ভাবে

বহে চলে ঘণ্টা মিনিট আর সেকেন্ডের কাঁটাগুলো। ইরাও একই পথের পথিক। মনে তার চিন্তার শেষ নেই। নয় নয় করে আরো বারোটা দিন ধরে তাকে সমানে অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোন দুর্ভাবনা নেই। যেখানে যেমনভাবে সম্ভব হবে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে সে চালিয়ে দেবে। কিন্তু এই গৃহের গৃহকর্তা মহান হৃদয় মালিকটিকে ছেড়ে যেতে হবে বলে তার কান্না যেন বুক ঠেলে উপরে উঠছে। এতো আরাম আর অফুরন্ত স্নেহ এর আগে সে কোনদিন কারো কাছ থেকে পায়নি। এডরিস আর ফিলের মতন নামকরা দুজন শয়তান পাপীকে এরকম অন্যায়ভাবে দিনের পর দিন মুখ বন্ধ রাখার জন্য টাকা যুগিয়ে যেতে হচ্ছে।

বারোদিন ধরে তাদের এই নির্যাতন সহ্য করে যেতে হচ্ছে বলে তার অনুশোচনার কোন অন্ত ছিল না। সেএখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত যোগানের এই ভয়াল স্রোত থামবে না। কিন্তু দিন যে আর কাটতেই চায় না।

রবিবারটা, ফিলেরও ইরার মতো একই দশা, দিনটা কাটতেই চায় না। রেডিও খুলে যতবারই সে কোরলে কোভে ডেডবডি পাবার আর তার সনাক্তকরণের জন্য জনসাধারণের কাছে পুলিশের তরফ থেকে এই ঘোষণা শুনেছে ততবারই ভয়ে চমকে উঠেছে...নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে আর মনে মনেকঠিন অভিশাপ বর্ষণ করেছে এডরিসকে। অনেক ভাবনা-চিন্তা আর জল্পনা-কল্পনার জাল বুনল বর্তমান আর ভবিষ্যত নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের শেষ সীমারেখায় পৌঁছে আর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে মিয়ামি এয়ারপোর্টে ফোন করে সোমবার বিকেলের ফ্লাইটের হাভানাগামী প্লেনে একটা সীটও বুক করে ফেলল।

ইরা আর ফিলের তুলনায় নার্ভের জোর আর আত্মবিশ্বাস এডরিসের দুই-ইছিল অনেক বেশী। ফিল যখন এয়ারপোর্টে ফোন করতে ব্যস্ত, সেই সময়ে তার দিকে তাকিয়ে একটা ক্রুর হাসি হেসে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। কর্মস্থলে গিয়ে সে দেখা করল ফ্লোর ম্যানেজার লুইসের সঙ্গে।

তাকে জানাল : তার পুরনো আর ঘনিষ্ট বন্ধু রোগে মৃত্যুশয্যায়, তাকে একবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে, তার দিন দশেকের ছুটির প্রয়োজন। একথা শুনে লুইস গম্ভীরমুখে জবাব দিল–সে নিশ্চিন্তে যেতে পারে তবে ছুটির মাইনে সে পাবে না।

–কি আর করা যাবে, তাই সে লুইসের কথা শুনে তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবার দুরন্ত লোভ সামলে নিল। ভাল মানুষের মতন এডরিস বলে উঠল, চেষ্টা করব আরো তাড়াতাড়ি ফিরতে, না আসা পর্যন্ত একটু কষ্টে-শিষ্টে কাজ চালিয়ে নেবেন। শত হলেও মরণাপন্ন বন্ধু মানুষ, তার অনুরোধ যতই হোক একেবারে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারি না, আর্থিক দিক থেকে আমার না হয় একটু লোকসান হবে।

হোমিসাইড স্কোয়াডের লোকজনদের কিন্তু রবিবার এই দিনটা কেটে যাচ্ছিল খুব দ্রুতগতিতে। বিশেষ করে কোরাল কোভ মার্ডার কেস নিয়ে যারা আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়েছিল, তাদের। ভাঙা চশমা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যতল্লাসের জন্য বেশ কিছু লোক ছোটাছুটি করে চলছিল বিভিন্ন জায়গায় জায়গায়।

সকাল, পৌনে আটটা। কিন্তু অত সকালেই মিঃ টেরেলের অফিস ঘরে মিঃ টেরেল শুধুই একা। বেইগলার আর হেস দুজনে একত্রে হাজির হয়েছেন।কফি খেতে খেতে আলোচনা

চলছিল। তাদের মধ্যে। পুলিশ ল্যাব থেকে পাঠানো ভঙ্গুর চশমার রিপোর্টটা–এই নিয়ে মোট তিনবার পড়লেন টেরেল। রিপোর্টে যা লেখা আছে সেটুকু বাদে যা উল্লেখ নেই তা নিংড়ে বার করার চেষ্টাতেই রত ছিলেন তিনি। রিপোর্টে লেখা হয়েছে : এই চশমা যে পরত সে অ্যাকিউট অ্যাসটিগম্যাটিজিম রোগে আক্রান্ত ছিল। তাই চশমাবিহীন সে একেবারেই অন্ধ। সবসময়ের জন্য তাকে চশমা পরে থাকতে হবে। তবে তার বাঁ চোখের চাইতে ডান চোখ অনেক বেশী আক্রান্ত।.মিঃ টেরেল লেখা লাইনগুলো মনে মনে বারংবার আউড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেলতে লাগলেন। তার মনে হচ্ছিল : সাফল্য যদি আসে তবে এই সূত্রধরে আসতে বাধ্য। তাই তিনি তার তিনজন সহকর্মীর উদ্দেশ্যে এই আদেশ দিয়েছিলেন : তারা যেন একশো মাইল পরিধির মধ্যে যেখানে যত হোলসেল চশমার দোকানের দেখা মিলবে...সেগুলির প্রত্যেকটিতে অবশ্যই চুঁ মারবে। তিনি এতেই ক্ষান্ত হননি, তাদের প্রতি কড়া হুকুম জারি করেছিলেন এই বলে :হোক রবিবার, চশমার পরকলা তৈরীর ফ্যাক্টরির মালিকের সন্ধান করে যে কোন উপায়ই অবলম্বন করতে হোক না কেন জোর করে ফ্যাক্টরি খোলাবে। শুধু তাই নয়, এও জানার প্রয়াস করবে যে এই ধরণের পরকলা সে কাদের কাছে সাপ্লাই দিয়েছে। আমি আজ বিকেলের মধ্যেই এর সব রিপোর্ট চাই।

জ্যাকবির ওপর আদেশ ছিল : টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে যতজন আই স্পেশালিস্ট-এর এবং যতগুলো হাসপাতাল–তা জেনারেলই হোক আর স্পেশাল বিষয়ই হোক,–এর নাম আছে, তাদের প্রত্যেকটির কাছে ঐ একই সংবাদ জানাতে হবে।

আরও তিনজনকে পাঠিয়েছিলেন যারা এই ধরণের প্লাস্টিকের চশমার ফ্রেম বানায়, তাদের নিকটে। যদিও তিনি জানতেন,রবিবারে এদের সম্পর্কে কুল কিনারা করা সত্যিই

কঠিন, তবু তাদের মধ্যে একজনকেও হাল ছেড়ে না দিয়ে প্রয়োজনে পুলিশীশক্তি আর অধিকারের সদব্যবহার করতে ঢালাও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

টেরেল এবার আরও একটি রিপোর্ট নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। রিপোর্টটা ছিল এই রকম: ঘটনাস্থলে পাওয়া একজোড়া জুতোর গোড়ালির ছাপ সংক্রান্ত। ল্যাব বলছে যে, যে ব্যক্তি ঐ জুতোর অধিকারী, সেলম্বায় ছফুটের কাছাকাছি, ওজনে ১৯০ পাউন্ডের মতন।জুতোর গোড়ালির ছাপ ১০ নং মাপের জুতোয়।

সাপ্লাই করেছে দি ম্যানসশপ–প্যারাডাইস সিটিরই একজন দোকানদার। সেখানেও একজন পুলিশ আর কর্মচারীকে পাঠিয়ে ছিলেন টেরেল...তারা খুব সম্প্রতি কাদের এই জুতো বিক্রী করেছিল, জানতে। কারণ জুতোজোড়ায় নতুনত্বের ছাপ তখনও স্পষ্ট।

দুপুরে লাঞ্চ সেরে মিঃ টেরেল এসে বসলেন তার টেবিলে। ইতিমধ্যে হেস আর বেইগলারও সেখানে উপস্থিত। হেস এর মুখ থমথমে কঠিন, তার মানে কোরাল কোভ-এ এই কয়েকঘণ্টার মধ্যেও কোন কু হাতে এসে পড়েনি যার দ্বারা অনুসন্ধান কোন নতুন দিকে মোড় নিতে পারে। বেইগলারের মুখ জুড়ে বিরক্তির ছাপ। তিনি জানালেন : ঐ ধরণের রুগী আর ঐ ধরণের চশমা পরে এমন ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সীবত্রিশজন মেয়ের সন্ধান করতে আমরা পেরেছিচী। মজার কথা এই যে, তারা কেউ কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট নয়। তবে শুধুমাত্র এ ব্যাপারে একটা সংবাদ দিতে এখানে সে জানাচ্ছে : গতমাসের ১৭ই মে নাকি একটি মেয়েকে সকাল ৮টা নাগাদ কোরাল কোভ-এর দিকে গাড়ি করে যেতে দেখেছিল।

খবরটা কানে যেতেই খুশিতে টেরেলের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি সহর্ষে বলে উঠলেন, লোকটা এখানে এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

ডিটেকটিভ রুমে বসে সামনে লিস্ট রেখে লেপস্কি, বেইগলার আর জ্যাকবি যে যাঁর ন্যস্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন টেলিফোন কানে লাগিয়ে।

একসময় লেপস্কি বললেন : ওহে জো! চশমাধারিনী কন্যাদের লিস্টে মেল ডেভনের কন্যার নামও আছে, খেয়াল করেছ?

হ্যাঁ, এতে আর কী এসে গেল? সে তো আর নিজের গা বাঁচিয়ে পালিয়েও যাইনি আর খুনও হয়নি। তবে?

না, তা নয়, আমার বলার উদ্দেশ্য হলো–সে কিন্তু চশমা চোখে লাগায় না।

সো হোয়াট? দয়া করে তুমি ভাই তোমার কাজ কর আর আমাকে আমার কাজ নিয়েই থাকতে দাও। মেল ডেভনের মেয়েকে অযথা ঘাটিও না।

লেপস্কি কিন্তু বেইগলারের মুখের বলা মন্তব্যে রাগ করলেন না। যথারীতি ভঙ্গিমায় শান্ত কণ্ঠে বললেন, নিজের কাজই তো করছি। আর সেই কাজ করতে গিয়েই তো স্মরণে এল:মিস নোরেনা ডেভনের চোখে চশমা নেই। কেননা, এই দেড় মাসের মধ্যে আমি তাকে ৪/৫ বার মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেছি, সতর্ক হয়েই লক্ষ্য করেছি–সে চশমা পরে না।

এবার কথাটার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন বেইগলার। তার দৃষ্টি ভরে ফুটে উঠল কৌতূহলের ছাপ। তিনি চট করে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে টেবিলের ওপর চশমা সম্পর্কে ল্যাব-রিপোর্টের কপিখানায় চোখ বুলিয়েছিলেন সেটা তুলে নিয়ে দ্রুত মনঃসংযোগ করলেন। তারপর লেপস্কির দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, তার মুখেও মৃদু হাসির রেখা।

বেইগলার বললেন, রিপোর্ট লিখছে, চশমার মালিককে সর্বক্ষণ চোখে চশমা পরে থাকতে হবেনইলে অন্ধত্ব তাকে ঘিরে ধরবে। আর তুমি বলছু, ডঃ উইডম্যান তার চশমাধারিনী রুগিনীদের নামের যে লিস্ট সাপ্লাই করেছেন তাতে নোরেনা ডেভনের নামেরও উল্লেখ আছে–তোমার বক্তব্য মতো সে বিনা চশমাতেই প্যারাডাইস সিটির রাস্তায় দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া-আসা করছে। এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হতে পারে? ডাক্তার এ বিষয়ে কোন ভুল রায় দেননি তো? আমি, এক্ষুনি একবার ডাক্তারের ফোন লাগাচ্ছি। এই বলে বেইগলার দ্রুত ডঃ উইডম্যানের নাম্বারে ডায়াল করলেন। কিন্তু ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। তার চেম্বারে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি জানাল :রাত নটার আগে চেম্বারে তাকে পাওয়া যাবে না।

হতাশ হয়ে বেইগলার ফোন নামিয়ে রাখলেন কিন্তু এতসহজে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি নন। তিনি লেপস্কিকে ডেকে তাঁকে স্বয়ং সেখানে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার ব্যাপারে অনুরোধ করলেন। লেপস্কি আর বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে তক্ষুনি রওনা হলেন।

একটু পরেই এসে হাজির হলেন সেই সংবাদ প্রদানকারীভদ্রলোক।নাম হেনরি টালাস, পেশায় মুদিখানার মাল সরবরাহকারী। তাকে নিয়ে যাওয়া হল চীফ টেরেলের কাছে।

হেনরী টালাস বললেন, আজ সকালে রেডিওতে আপনাদের ঘোষণা শুনলাম। মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। তাই ভেবে দেখলাম : যা দেখেছি তা আপনাদের কাছে উপস্থাপনা করতে ক্ষতি কী? অবশ্য এতে যদি কোন আসল কাজ হয়ে যায়।

চীফ টেরেল তার এই নাগরিকতা বোধের জন্য একপ্রস্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। টালাস শুরু করলেন তার কাহিনী।

গত মাসের সতেরো তারিখে আমি সীকোষ-এ চলেছিলাম কয়েকজন কাস্টমারের কল অ্যাটেন্ড করতে। আমার গাড়ির আগে আগেই যাচ্ছিল একটা রোডমাস্টার বুইক কনভার্টিব। হুড খোলা। তাতে দুজন আরোহী। একজন মাঝবয়সী পুরুষ, বয়স প্রায় ৩৮/৪০ আর সোনালী কেশ এক তরুণী। বয়স আন্দাজ সতেরো/আঠারো হবে। পরনে সাদা রঙের সার্ট, মাথায় ঘোট কালো রঙের টুপি, চোখে নীল ফ্রেমের চশমা।

(এইখানে টেরেল এবং বেইগলার পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।)

টালাস তার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন–যদি না বুইকটা হঠাৎ হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে কোরাস কোভ-এ যাবার সরু পথটায় ঢুকত তবে ভুলে বসতাম ওদের প্রসঙ্গ। কিন্তু অসময়ে পিকনিকের সাজ-ঘর সরঞ্জাম ছাড়াই তাদের ঐ পথের দিকে এগোতে দেখে কম অবাক হইনি আমি।

যাইহোক, যে কথা বলছিলাম, সীকোষ-এ আমার কাজকর্ম সেরে ফেরার মুখে বাস টার্মিনাসের কাছে একটা পাম্পে এসে গাড়িতে গ্যাসোলিন ভরছি, একই সময় আবার

সেই বুইকটা এসে দাঁড়াল একটু দূরে। সেই লোকটা তারপর গাড়ি থেকে নেমে ঐ বাস টার্মিনাসের একটা বেঞ্চে বসে থাকা একজন মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

–তোমার দেখা সেই আগের মেয়েটাই কী?

-না, অন্য একজন। টালাস একটু থামলেন, তারপর লাজুক হাসি হেসে বললেন, তিন ছেলে মেয়ের বাপ আমি..ঘরে স্ত্রী আছে...বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করে গেছি, কিন্তু নিজের মুখে আর কী বলব আপনাদের, মেয়েটার যা চাবুকের মতো দেহের গড়ন...এক লহমায় বুকের রক্ত যেন চলকে উঠল। আগে ওকে দেখিনি, বুইকের লোকটাকে দেখতে গিয়েই ওর দিকে দৃষ্টি পড়ল। দুজনের মধ্যে কী সব কথা হল।

–গাড়িটার নাম্বার প্লেট লক্ষ্য করেছিলেন?

-না স্যার,আবার পূর্বের সেই লাজুক হাসির ঝলক টালাসের মুখে।-সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটির রূপ যৌবন দুচোখ ভরে উপভোগ করতে গিয়ে গাড়িটার নাম্বার প্লেট দেখার কথা আমার মাথায় আসে নি। তবে এটুকু বলতে পারি গাড়িটা ছিল দুরঙা,লাল ও নীল। বছর দেড় দুইয়ের মতো পুরোনো হবে।

-আর সঙ্গের লোকটি?

লোকটি?গলা চুলকে টালাস আবার তার কথা শুরু করলেন, আন্দাজ ছফুট মতো লম্বা, চওড়া কাঁধ দুশো পাউন্ডের কম ওজন কখনোই হবে না। সুদর্শন, তামাটে মুখ, সোনালী চুল, সরু গোঁফ, মাথায় ব্রাউন রঙের স্ট্র হ্যাট, পরণে ফন কালারের সুট।

লোকটির বর্ণনা টালাসের মুখ থেকে শোনার পর বেইগলার সহসা নড়ে চড়ে উঠলেন। তার স্মৃতির দুয়ারে এই বর্ণনা যেন হালকা হলেও বেশ কয়েকবার করাঘাত করে গেল।

তিনি এতক্ষণ ধরে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন, এবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, মিঃ টালাস! লোকটির মুখের চেহারায় আর কোন বিশেষত্ব ছিল যা আপনার চোখে ধরা পড়ে নি?

বিশেষত্ব বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন তা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, তবে থুতনিটা ছিল চেরা কতকটা...এই ফিল্মস্টার ক্যারী গ্রান্টের মতন।

এই পর্যন্ত শুনেই বেইগলার উত্তেজিত হয়ে টেরেলের টেলিফোনটা টেনে নিয়ে রিসিভার তুলে একটু দম নিয়ে বললেন, কে ম্যাক্স? শোন, কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক পুলিশ ফিল অ্যালগিরের যে ছবিটা আমাদের কাছে পঠিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি পার সেটা পাঠিয়ে দাও।কুইক।তারপর রিসিভার রেখে টেরেলকে বললেন, আমার ভুলও হতে পারে তবে বর্ণনার অনেকটাই বহু খাপ খেয়ে যাচ্ছে ফিল অ্যালগিরের চেহারার সঙ্গে, চীফ। তাই একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষতি কী! মিঃ টালাস, ছবি আসতে আসতে আপনি ঐ দ্বিতীয় রমণীর চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন কি?

কেন পারব না বল? আমি খুব ভালভাবে দুচোখ ভরে তাকে দেখেছিলাম। লোকটি যদি ক্যারী গ্রান্ট হয় তো মেয়েটি ছিল মেরিলিন মুনরো। তবে কাঁচা বয়স,বছর ১৮/১৯...লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের মতন...চমৎকার দেহের শরীরী গড়ন, পরনে ছিল গাঢ়

সবুজ রঙের সোয়েড জ্যাকেট আর কালো রঙের টাইট-প্যান্ট মাথায় ছিল সাদা রঙের হেডস্কার্ফ।

–সে এয়ারপোর্ট বাসে এসেছিল?

–হ্যাঁ। আমি যে মুহূর্তে পাম্পে এলাম আর সেও পদার্পণ করল বাস থেকে, তার পর এগিয়ে আসন সংগ্রহ করল বাস-টার্মিনাসের একটা বেঞ্চে।

ইতিমধ্যে জ্যাকবি ফিল অ্যালগিরের একখানা ছবি নিয়ে সেখানে হাজির হল।

ছবিখানা নিয়ে মিঃ টালাসের হাতে দিয়ে বেইগলার জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, এই সেই লোক। কিনা দেখে বলুন তো।

মনযোগ সহকারে দেখার পর টালাস জানালেন তার চিনতে এতোটুকু ভুল হয়নি, হ্যাঁ, এই সেই ব্যক্তি।

মিঃ টালাসকে সমাদরের সঙ্গে বিদায় দিয়ে টেরেল খুশী খুশী মনে বলে উঠলেন, এতক্ষণে আমরা একটু ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখতে পাচ্ছি। হেকে একবার ডাক জো।

হেস এলে তাকে টালাসের সব কথা পুনরুক্তি করে টেরেল বললেন, দ্বিতীয় মেয়েটার সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নাও ফ্রেড। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে নিশ্চয়ই নিউইয়র্ক ফ্লাইটে সে এখানে এসেছিল।

ফ্রেড, এই ব্যাপারে সবরকম খোঁজ খবরের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। শুধু একটা কথাই। মাথায় ঢুকছে না, ফিল অ্যালগির জীবন ব্যাপী একজন প্রতারক থেকে হঠাৎ খুনীর জীবন বেছে নিল কেন?

মিয়ামি এয়ারপোর্টের এয়ার কন্ট্রোল অফিসে গিয়ে গতমাসের ১৭ তারিখের নিউইয়র্ক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার্স লিস্ট চেক করতে করতে একটা নামের ওপর হেসের দু চোখের দৃষ্টি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মুখ কঠিন, কুঁচকে গেল যুগল ভ্রূ। নামইরা মার্শ। তিনি ভাবতে লাগলেন :এটা কী কোন কাকতলীয় ব্যাপার? মুরিয়েল মার্শ...ইরা মার্শ...পদবীর ক্ষেত্রে এমন অদ্ভুত সব মিলের বহর..আত্মীয়তা আছে নাকি দুজনের মধ্যে?

তিনি এনকোয়ারিতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন ইরার সম্পর্কে। তারা জানাল : মেয়েটি ট্রাভেল করছিল একাকী। ঠিকানাও দেওয়া আছে : ৫৭৯, ইস্ট ব্যাটারি স্ট্রীট, নিউইয়র্ক।

ধন্যবাদ জানিয়ে এয়ার কন্ট্রোল অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন হেস। তারপর সোজা হেডকোয়ার্টার্সে। তার কাছ থেকে রিপোর্ট পাবার পর মিঃ টেরেলের মুখ হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, খোঁজ নাও ইরা মার্শ ডেভনের স্ত্রীর সম্পর্কে কোন আত্মীয় কিনা। এমনও হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মিসেস ডেভনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তা হল, সে ফিলের খপ্পরে পড়ল কীভাবে?

এমন সময়ে বেইগলার আর লেপস্কি হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন সে ঘরে। বেইগলার কিঞ্চিত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, চী! একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

যে সব মেয়েরা অ্যাকিউট অ্যাসটিগম্যাটিজম চোখের রোগে কষ্ট পাচ্ছিল এবং তারজন্য ঐ। রকম পাওয়ারের লেন্স ব্যবহার করছে তাদের চশমায়–তাদের নামের লিস্টে আপনার বন্ধু মেল ডেভনের মেয়ে নোরেনা ডেভনের নামেরও উল্লেখ আছে।

কিন্তু টম জোর দিয়ে বলছে, গত এক মাসের মধ্যে কম করে হলেও পাঁচ/ছয় বার মিস ডেভনকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে বিনা চশমায়। আমি ওকে পাঠিয়ে ছিলাম ডঃ উইডম্যানের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে। কারণ তিনি ঐ নামের লিস্ট পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে। সেখানে গিয়ে টম কী জানতে পেরেছে তা ওর মুখেই না হয় শুনুন।

বেইগলার চুপ করলে টম লেপস্কি বললেন, চী! ডাক্তার উইডম্যান জোর দিয়ে বলেছেন, নোরেনা ডেভন একজন উৎকট চক্ষুরোগের রুগীতার ডান চোখটা বা চোখের তুলনায় নাকি বেশী অ্যাফেকটেড।

টেরেল মুহূর্তের জন্য তার উষ্মা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, তোমরা যখন জানছ..দেখছ যে মিস ডেভন বহাল তবিয়তে এই শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে–তখন শুধু শুধু এই লোক দেখানো হয়রানির কী প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়েছিল এভাবে সময় নষ্ট করার?

লেপস্কি ধীরজ কণ্ঠে বললেন, সরি চীফ! আমি ভাবলাম ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটু গোলমালের গন্ধ পাচ্ছি। ডাক্তার লিখছেন নোরেনা ডেভন চশমা পরে কিন্তু আমি তাকে

বিনা চশমাতেই চালকের আসনে বসে গাড়ি চালাতে দেখেছি। এ আবার কেমন ধারা কথা? ডাক্তারের রিপোর্ট, এই রোগের রুগী বিনা চশমায় অন্ধেরই সমান। অথচ

টেরেল কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর বললেন, ঠিক আছে, টম আমি এ নিয়ে পরে আলোচনায় বসব মেল-এর সঙ্গে। তুমি আগে ফিল অ্যালগিরের ছবিটা নাও, হোটেলে হোটেলে সন্ধান কর তার। এখনও সে এই শহরের কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে কিনা খবর নাও চটপট।

লেপস্কি চলে যেতে টেরেল বেইল্লারকে বলে উঠলেন, আর তোমাকেও বলি জো, কী দরকার ছিল এইসব অদরকারী কাজে বৃথা সময় নষ্ট করার? আমার তো মনে হয়, এইসব বিশ্রী ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে সেই বুইক গাড়িটা নিয়ে তোমাদের একবার অনুসন্ধান করা খুব-ই উচিত ছিল।

–তারও সন্ধান নিয়েছি চী। ফিল অ্যালগিরই গাড়িটা ভাড়া করেছিল হ্যারী চেম্বার্স এই বেনামিতে।

–ঠিকানা পাওনি?

—হ্যাঁ, তাও পেয়েছিতবে ফল হয়নি কিছু। আজ সকালের দিকেই গাড়ি আর হোটেল সুইটের ভাড়া মিটিয়ে সে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। টেরেলের ভ্রূ যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল, নিজের ঘড়ি দেখে নিয়ে তারপর বললেন, আজ সকালে? তার মানে এখনও সে এই শহর ছেড়ে যায়নি। জো! তুমি চারদিকে ওর সন্ধানে লোক ছড়িয়ে দাও। রেডিও আর টিভিতে ওর চেহারার বর্ণনা আর ছবি দিয়ে ঘোষণার ব্যবস্থা করো।

৯-১০. এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে

০৯.

এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে বসে রেডিও খুলে খবর শুনছিল এডরিস আর ফিল। দুজনের মুখই থমথমে। ঘোষক তখন এই বিবৃতি ঘোষণা করছিলেন :

কোরাল কোভ মার্ডার কেসেনতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। পুলিশ ফিল অ্যালগির ওরফে হ্যারী চেম্বার্স-আপাততঃ যার ঠিকানা ছিল: রিজেন্ট হোটেল, প্যারাডাইস সিটি–এই ব্যাক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই মার্ডার কেস সম্পর্কে সে অনেক কিছুই জানে। লোকটির উচ্চতা–ছ ফুট, ওজন ১৯০ পাউন্ড, বলিষ্ঠ কাধ, চুলের রঙ সোনালী, সরু গোঁফ, নীল চোখের তারা আর থুতনীর নীচে বিরাজমান একটি ভাজ। তার শেষ দেখা মেলে, যখন সে লাল ও নীল রঙের টু-টোনবুইক কনভার্টিবল রোডমাস্টার গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির লাইসেন্সনাম্বার–এন ওয়াই ৪৫৯৯। এই ব্যক্তির গতিবিধি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খবর কেউ যদি রেখে থাকেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স : প্যারাডাইস সিটি ০০১০ এই নাম্বারে অবিলম্বে ফোন করবেন।

এই সংবাদে এডরিস আর ফিল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো আধ-মিনিট ধরে বসে রইল নিজের নিজের আসনে। ফিলেরই প্রথম সম্বিত ফেরে। সে এডরিসের দিকে রক্তবর্ণ চোখে চেয়ে ষাঁড়ের মতন গর্জন করে বলে উঠল,হতভাগা বাঁটকুল! তোর জন্যই আজ আমার এই সমূহ বিপদ। তোকে খুন করে আমার নিস্তার মিলবে হতচ্ছাড়া!

চেয়ার ছেড়ে ফিল দাঁড়াবার আগেই ভীতত্রস্ত শঙ্কিত এডরিস চকিতে ছুটে গিয়ে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দরজায় খিল তুলে দিল। ফিল খিস্তির ফোয়ারা ছোটাল, অনেক কসরত, ধাক্কাধাক্কি করল বন্ধ দরজার গায়ে তবু হার মেনে দরজা খুলল না জেদী এডরিস। সে তখন নিরক্ত মুখ নিয়ে বিছানায় বসে থর থর করে কাঁপছে।

পরিশেষে ঘণ্টাখানেক পর একাধিক হুইস্কি পেটে পড়তেই ফিলের রাগ গলল। সে তখন বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে শান্তকণ্ঠে বলছে, অলরাইট, টিকি, এবার বেরিয়ে এসো। আমি তোমার গায়ে হাত তুলব না। প্রমিস।

কিছুক্ষণ দোটানায় থাকার পর দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল এডরিস। কিন্তু বেরিয়েই আবার ভয়ে কাটা। ফিলের হাতে রিভলবার-এডরিসের দিকে তাক করা।

ফিল হুকুম করল : বসো একটা চেয়ার টেনে। কথা আছে।

এডরিস ভালো মানুষের মতন বসে পড়ল। ফিল বলল, শোন টিকি, এখনো বাঁচবার সুযোগ আছে। কোন উপায়ে আমরা যদি পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এই শহর ছেড়ে বেরিয়ে মিয়ামিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি, তবে আমার যে বন্ধু সেখানে আছে তার সাহায্যে জাহাজে চেপে আমরা কিটরায় পালাতে পারব।

কিন্তু ওর বড় টাকার খাই, তাই এই শহর ছেড়ে যাবার আগে যতটা পরিমাণ সম্ভব হয় টাকার বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে। আমার মতামত যদি নাও তো বলি, গ্যারল্যান্ডের সিন্দুক খালি করেই আমরা দুজনে কেটে পড়ি চল।

এডরিস অতি কষ্টে ম্লান হাসি এনে বলল, কিন্তু হাঁদারাম। একবার ভেবে দেখছ কি, ব্যাঙ্কে যাবার সব পথই বন্ধ প্রায়? ওরা তোমায়,চিনে ফেলবে না?

–আমি ব্যাঙ্কে যার কোন দুঃখে? ইরাকে ফোন করে বল, সে যেন ব্যাঙ্কের উল্টোদিকের সেই কাফেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে। তারপর কীভাবে টাকা আনবে, কেমন করে আনবে–সেটা সম্পূর্ণ ভাবে তার ভাবনাচিন্তার ওপরই ছেড়ে দাও।

এডরিস কোন রকম প্রতিবাদ জানাতে সাহসিকতার পরিচয় দিতে উদ্যোগীনা হয়ে সে ফিলের আদেশ ও নির্দেশমতো ফোন করল ইরাকে।

তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসায় ফিল আবার হুকুম করল রিভলবার উঁচিয়ে–ওয়ানসির সিন্দুক এবং আরও ২/১টি সিন্দুক লুট করে যা মাল পাওয়া গেছে, তার ভাগ, আমার অংশের পঁচিশ হাজার ডলারচটপট দিয়ে দাও। আমার কথার অন্যথা হলে গুলিতে পেট ফুটো করে ঝাঁঝরা করে দেব স্মরণে রেখো। নাউ কুইক।অনোন্যাপায় হয়েই বেজার মুখে আলমারি খুলতে লাগল এডরিস। মনে তখন তার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

নিজের টেবিলে বসে থাকাকালীন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঝিমোচ্ছিলেন বেইগলার। ডেস্কের ওপর টেলিফোনটা ঠিক এই সময়ে সরব হয়ে উঠল। ক্লান্ত আর অলস কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন রিসিভার তুলে–হ্যালো–

–হ্যালো, জিম, কী খবর? —

ফিল অ্যালগিরের ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল। লোকটা আমাদেরই ব্যাঙ্কে একটা লকার ভাড়া নিয়ে প্রতিদিনই আসা যাওয়া করছে।

–তাই নাকি? সজাগ আর সতেজ হয়ে উঠলেন বেইগলার।

তোমাদের ব্যাঙ্কে সে ভাড়া নিয়েছে। কেন?

— নামীদামী জুয়াড়ীবলে তার এখন বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট হাঁক ডাক। সে ভাড়া নিয়েছে অবশ্য লসন ফরেস্টার-এর ছদ্মনামে। কিন্তু রেডিওতে ওর চেহারার বর্ণনা শোনার পর থেকে আমি নিশ্চিত যে, লসন ফরেস্টারই ফিল অ্যালগির।

হু,কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বেইগলার বললেন, ঠিক আছে জিম, আমার দপ্তরে কেউ একজন এলেই আমি তাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিঃ ডেভনকে বলে ওর লকারে কী আছে তা আমাদের জানা খুবই দরকার। আর ফিল যদি এরমধ্যে এসে উপস্থিত হয়, তবে তাকে আটকাবার ভার তোমার ওপরই দিলাম বন্ধু।

পূর্ব নির্দেশমতো যথাসময়ে কাফেতে গিয়ে উপস্থিত হল ইরা। এডরিস ওর আসার আগে থাকতেই বসেছিল। ইরা গিয়ে বসল সেই টেবিলে। জিজ্ঞাসা করল : আবার তলব কেন?

-আজকের খবরের কাগজটা একবার দেখেছ?

–না। সময় পাইনি চোখ বোলাবার।

–ফিল ফেঁসে গেছে। পুলিশ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওর জন্য বিপদ আমারও দোর গোড়ায় এসে হাজির। আমাদের হাতে সময়ের বড় অভাব, বেবী। তাই যা যা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনে নাও। গ্যারল্যান্ডের সেফের নকল চাবি দিচ্ছি তোমায়। যেমন করে যেভাবে সম্ভব হয় মালকড়ি সরিয়ে ফেল। ফিল আসতে পারবে না, তাই একাজটা তোমাকেই উদ্ধার করতে হবে।

-না, না আমার দ্বারা একাজ আর হবে না।

–মা বললে শুনবো না। একাজ তোমাকেই করতে হবে। ফিল কেন আসতে পারবে না তা এই কাগজেই দেখ।বলে, পকেট থেকে সেদিনকার কাগজখানা বার করে ভাজ খুলে ইরার দিকে সহস্তে বাড়িয়ে ধরল এডরিস। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আপাদমস্তক পড়ে গেল ইরা। সারা দেহ এক অজানা আতঙ্কে থর থরে করে শিউরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে কোনরকমে এটুকু উচ্চারণ করার সম্বিত ফিরে পেল, শুধু বলল : একি! এ যে দেখছি খুনের ব্যাপার। তবে কি ফিল–

–হ্যাঁ, ফিলই খুন করেছে তোমার দিদির মেয়ে নোরেনাকে। আমি সেদিন তোমায় মিথ্যে বলেছিলাম যে জলে ডুবেতার মৃত্যু হয়েছে। তাকে এখান থেকে সরে পড়তে হলে টাকার দরকার প্রচুর। এই প্রয়োজন না মিটলে সে তো ডুববেই সেই সঙ্গে আমাদের দুজনের ভরাডুবিও অবশ্যম্ভাবী।

–অসম্ভব! আমার দ্বারা কোন মতেই সম্ভব নয় গ্যারল্যান্ডের টাকা চুরি করা। তীর ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়াল ইরা। নোরেনার খুনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলছ কেন? আমি একেবারেই অজ্ঞাত নোরেনার খুনের ব্যাপারে।

–শাট আপ! চাপা গলায় ধমকের সুরে চিৎকার করে উঠল এডরিস, পুলিশ অতসহজে তোমায় ছেড়েও দেবে না আর তোমার কথায় ভুলবার পাত্রও তারা নয়। তুমি সব কিছু না জেনে বুঝে নোরেনা সেজে দিনের পর দিন অভিনয় করে যাচ্ছ, তাই না? তোমার একথা তারা বিশ্বাস করবে? খুনী না হতে পারো তবে খুনীর সহকারিনী হয়েছে তো। আমি আর ফিল অবশ্য গ্যাস চেম্বারে ঢুকব। কিন্তু তোমার মতো একজন সুন্দরীকে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসে থেকে প্রতিনিয়ত জ্বালায় যন্ত্রণায় অত্যাচারে অপমানে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে, তখন মনে হবে, এই যন্ত্রণার থেকে মরণই বোধহয় অনেক শ্রেয় ছিল তাতে শান্তিও কিছুকম ছিলনা।ইরানীরব শ্রোতা।

এডরিস তার বুদ্ধি বলে ইরাকে এমন ভাবে প্রভাবিত করল যে তার কথা বলাতে ওষুধ ধরেছে। সে তাই জিজ্ঞাসা করল : কী, আমার প্রস্তাবে মত আছে তো? টাকা হাতে আসতে যতক্ষণ দেরী, এসে গেলেই আমরা পালিয়ে বাঁচব এই শহর থেকে। তুমিও স্বাধীন বিহঙ্গ হয়ে উড়তে পারবে। তখন দেখবে মুক্তির আনন্দই আলাদা। আর যদি এ ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ না থেকে থাকে তবে জেলে পচে মরবে অবধারিত।

ইরা দম দেওয়া সম্মোহিত পুতুলের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, আমি প্রস্তাবে রাজী।

সাড়ে আটটা থেকে পৌনে দশটা–এই সোয়া এক ঘণ্টা সময় নানা চিন্তা ভাবনার স্রোতে কখন যে বয়ে গেছে তা খেয়াল করার শক্তি ছিল না ইরার।

ভল্টে পৌঁছে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। নিঝুমহয়ে গুম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকল.তারপর মনকে সংযত আর দৃঢ় ভীতে সবে দাঁড় করিয়েছে এমন সময় একজন গার্ড এসে জানাল : মিঃ ডেভন আপনাকে ডাকছে, মিস।

-চলো, যাচ্ছি।

ডেভনের চেম্বারে প্রবেশ করতেই দৃষ্টি একেবারে স্থির হয়ে গেল। কারণ চেম্বারে ডেভন একা ছিলেন না, তার সামনের আসনে আরো একজন অচেনা ব্যক্তি বসে আছে। তাকে না চিনলেও ইরা তার বুদ্ধির দৌড়ে এটুকু বুঝতে পারল ভদ্রলোক পুলিশের একজন। তার সিক্সথ সেন্সই যথেষ্ট প্রখর। ইরা তাই ঘাবড়ে গেল না, সে ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল : আমায় ডেকেছিলে ড্যাডি? :

-হ্যাঁ, ডার্লিং, এসো। এনার পরিচয় ইনি ডিটেকটিভ টম লেপস্কি। কোন একটাকাজে তোমার কাছ থেকে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায় এখানে এসেছেন।

লেপস্কি কোমল স্বরে বললেন, বসুন, মিস ডেভন, খুব বেশী সময় আপনার নেব না। মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে বলুন তো একে আপনি চেনেন কিনা–

এই বলে পকেট থেকে ফিল অ্যালগিরের ছবি বার করে লেপস্কি দেখালেন ইরাকে এবং গোটা কয়েক প্রশ্নও করলেন। প্রত্যুত্তরেইরা শুধু জানাল :হ্যাঁ লোকটির নাম ফরেস্টার, ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কের একজন ক্লায়েন্ট। তবে তার লকারে কি আছে না আছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণাই নেই তার।

আরও একটা প্রশ্নের উত্তরে ইরা জবাব দিল না, সে মিয়ামির এই ডাক্তার উইডম্যানের নাম কখনো শোনেনি এবং এর পূর্বে তাকে চোখের দেখা দেখেনি পর্যন্ত।

তার জবাবে লেপস্কির মনে সন্দেহের বীজ আরো ঘনীভূত হলো।

ডাক্তার উইডম্যান নিজ মুখে এই স্বীকৃতি দিয়েছেন–নোরেনা ডেভনতার দীর্ঘদিনের রুগিনী। নোরেনার বক্তব্য ইতিপূর্বে ডাক্তারের নাম পর্যন্ত শোনেনি। আরও একটা পরীক্ষা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন লেপস্কি। তাদের দুজনের মধ্যে যা যা কথাবার্তা হলো, সে সমস্ত একটা কাগজে ছোট ছোট কিন্তু পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে ইরাকে সেটা পড়ে দেখে সই করে দিতে অনুরোধও করলেন। ইরা কাগজটা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল তারপর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে সই করে দিল। লেপস্কির মনে তখন সন্দেহের ঝড় তোলপাড় করছে। ডাক্তার উইডম্যানের মতে, নোরেনা ডেভন বিনা চশমাতে একেবারেই অন্ধ।

কিন্তু এই মেয়েটি তো চশমা ছাড়াই দিব্যি লিখছে আর পড়ে যাচ্ছে। তবে কে? যাইহোক, শুষ্ক হাসি হেসে উঠে পড়লেন লেপস্কি চেয়ার ছেড়ে। তারপর নিজের

কাগজপত্র গোছাতে গোছতে বলে উঠলেন, আর একটা শেষ প্রশ্ন মিস ডেভন। আপনি কখনো ইরা মার্শ নামের কোন মেয়ের কথা ইতিপূর্বে শুনেছেন?

প্রশ্নটা কানে যেতেই শামুকের মতো খোলসে গুটিয়ে গেল ইরা। মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মরিয়ার মতো শুধু বলল, না..না...ও নাম আমি কখনো শুনিনি।

বিহ্বল আর বিবর্ণ চোখ মুখের এমন দশা দেখে মেল তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন মেয়ের কাছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোলেন : কী হয়েছে নোরেনা? তুমি কী সুস্থ নও? শরীর কী ভালো নেই?

-হ্যাঁ, ড্যাডি ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখুনি বাড়ি যেতে চাই। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিলে আশাকরি সুস্থ হয়ে যাব।

মেল তাকালেন লেপস্কির দিকে। লেপস্কি দুঃখ প্রকাশ করে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

কেউই কিন্তু তার দুচোখ ভরা খুশির দীপ্তি আর উত্তেজনা লক্ষ্য করল না।

ইরা আসতেই এডরিস ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : এনেছ?

–তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাওঃআমার দিদিকেও তোমরাহত্যা করেছ, তাই না?

এডরিস এই প্রশ্ন ইরার মুখ থেকে শুনতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই একটু ঘাবড়ে গেল। অতি দ্রুতলয়ে সেই ভাবসামলে উঠে উত্তর দিল, সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন? নেশাই তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাকে শুধু সেই নরক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। সে থাক, সঙ্গে টাকা এনেছ?

–তার হাত ব্যাগের মধ্যে থেকে সুসাইড নোটটা পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেও তোমার কৃতিত্ব ছিল, তুমিই সেটা লিখেছিলে?

এডরিস একটু অতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিল–হ্যাঁ। তাতে হয়েছেটা কী? তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পুলিশ যেসব চিঠিপত্র পেয়েছে, সবই আমার লেখা। শুনে একটু শান্তি পেয়েছ তো? এবার আসল কথা বলোটাকা এনেছ কিনা?

–তুমি তার মনের মানুষকেও খুন করেছ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য?

–না, ও ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ফিলের। ও আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করল। ওর উপস্থিতিতে আমাদের প্ল্যানে কোনদিন সাফল্যের মুখও দেখতে না। টাকা এনেছ?

যেজন্য আমার এখানে আগমন, একটা মুখোরাচক সংবাদ তোমার জন্যই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ব্যাঙ্কে একজন পুলিশের লোক এসেছিল। আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে, ইরা মার্শ নামের কোন মেয়ের সঙ্গে আমার চেনা-জানা আছে কিনা।

মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়ল এডরিসের। কয়েক মিনিট পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ অতিমাত্রায় সে সক্রিয় হয়ে উঠল। দ্রুত কণ্ঠে বলল, কই?

টাকাটা দাও আমায়! আমার সঙ্গে চললা, পালাই এ শহর ছেড়ে। এখনও হাতে সময় সুযোগ দুই আছে। এসো টাকাটা দাও।

টাকা আমি আনিনি, খালি হাতে এসেছি, আনার সুযোগ থাকলেও আনতাম না। আমি যাব না তোমার সঙ্গে। এরপরের সাক্ষাৎনা হয় পুলিশ কোর্টের জন্যই তোলা থাক আমাদের। বাই। এডরিসকে বাক্যস্ফুর্তির কোনরকম সুযোগ না দিয়ে কাফে থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ইরা।

ভাড়া করা ফোর্ড গাড়িতে বসে গোপনে সবই নজর রেখে চলছিল জেম ফার। সে শুধু অবাক হয়েছিলফিলের পরিবর্তে এডরিসকে কাফেতে আসতে দেখে।কারণ ইরার কথা মতোনকল চাবি দিতে ফিলেরই আসা উচিত। আসলে সেদিনকার খবরের কাগজ পড়া হয়ে ওঠেনি জেম-এর। তাই সে ফিলের সমূহ বিপদের ব্যাপারে একেবারের জন্যও জানার সৌভাগ্য তার হয়নি।

জেস মনে মনে ভাবল–আসলে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। কী এমন এর মধ্যে ঘটে গেল যার জন্য অবসন্নের মতো বিধ্বস্ত অবস্থায় ইরাকে বেরিয়ে আসতে হল কাফে থেকে। দ্বিতীয়ত কেনবা এডরিসের এতো ব্যস্ততা?

মন স্থির করে দুজনের মধ্যে এডরিসের নাগাল পাবার জন্য তাকে অনুসরণ করাই হয় বলে মনের দিক থেকে সে সাড়া পেল।

লেপস্কির বুঝতে কষ্ট হল না যে নিজের ছকে যে কাজ করতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তা যদি সফলতা পায় তবে তো কোন কথাই নেই।

আর যদি ব্যর্থতার মুখ দেখেন তবে চীফের হাতে তার নাকালের অন্ত থাকবে না। তিনি নোরেনা ডেভনের বিষয়ে বিষদ ভাবে জানার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার স্কুলের গণ্ডির মধ্যে। যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় পত্র দেখিয়ে, তারপর সম্মুখীন হলেন ডক্টর গ্রাহামের। সোজাসুজিই কাজের কথাই উত্থাপন করলেন।

–ডঃ গ্রাহাম! আমি আপনার এই স্কুলের এক ছাত্রী–নাম মিস নোরেনা মার্শ ডেভন, তার বিষয়ে কিছু খোঁজ খবর সংগ্রহের জন্যেই আমার এখানে আগমন। আপনার কাছ থেকে ঐকান্তিক সহায়তা পেলে অনুগৃহীত হব আমি।

–নোরেনা ডেভন? সে বর্তমানে এখানে নেই। মাস দেড়েক আগেই স্কুল ছেড়ে চলে গেছে টার্ম শেষ করে। জানি আপনি শুধু মনে করে বলুন তার চোখে চশমা থাকত কিনা?

–হ্যাঁ থাকত বৈকি। সে চশমা পরত।

–চশমা ছাড়া তার পক্ষে কোন কাজ করা এককথায় সত্যিই অসম্ভব ছিল–ঠিক তো?

-হ্যাঁ। ভীষণ ভাবে চোখ খারাপ ছিল তার। কিন্তু কেন, আপনি এসব জানতে চাইছেন সেটা শুধু বুঝতে পারছি না।

নোরেনার চশমার ফ্রেমটা কী নীল রঙের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী ছিল?

ডঃ গ্রাহাম কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিলেন : নীল রঙের ফ্রেম ছিল তা মনে আছে, কিন্তু ফ্রেমটা প্লাস্টিকের তৈরী ছিল কিনা সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর হচ্ছে না, মিঃ

অফিসার। এবার ডঃ গ্রাহাম একটু বিরক্তির সঙ্গেই শুধু বললেন, সেই থেকে শুধুনানা রকম প্রশ্ন করে চলেছেন কিন্তু কেন যে করছেন তা তো খুলে বলছে না?

লেপস্কি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জানালেন:উই হ্যাভ রিজন টু বিলীভ দ্যাট কোরাল-কোভ-এ নিহত অবস্থায় যে আনআইডেন্টিফায়েড মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সে নোরেনা ডেভন ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না।

ডঃ গ্রাহামের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। লেপস্কি এবার ফিল অ্যালগিরের ফটোগ্রাফ বার করে ডঃ গ্রাহামকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইতিপূর্বে একে কখনো দেখেছেন?

ডঃ গ্রাহাম কয়েক মিনিট ধরে মন সংযোগ করে ছবিটা দেখে নিয়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ইনি তো নোরেনার মায়ের অ্যাটর্নি। এঁরই সঙ্গে নোরেনা গিয়েছিল তার মার অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে।

–আপনাদের এখানে নোরেনার কোন ছবি পাওয়া যেতে পারে, ডঃ গ্রাহাম?

পাওয়া যাবে। টার্ম শেষ করে ছাত্রীরা যখন স্কুল ছেড়ে চলে যায়, তাদের একটা গ্রুপ ফটো তুলে রাখা হয়। একটু বসুন, ছবি আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

.

১০.

এডরিস গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে একটা কথাই তার মনে বারংবার ঘুরপাক খেয়ে আসছিল। যে কথার জন্য সে এতো বিব্রত বোধ করছে তা হল ফিলের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নেওয়ার সময় এবার এসে গেছে। হতভাগা রিভলবারের ভয় দেখিয়ে তার সব টাকা কড়ি হাতিয়ে নিয়ে বসে আছে আর টাকা ছাড়া শূন্য হাতে গা ঢাকা দেওয়া একেবারেই বৃথা। আজ এ ব্যাপারে তারা একটা শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েই ছাড়বে, যা হবে তা দেখা যাবে। কিন্তু সে তো অস্ত্রহীন, একটা অস্ত্র হাতিয়ার রূপে না কাছে থাকলে কোন ভরসায় সে ফিলের মুখোমুখি হবে? সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিল সীকোষ-এর শহরতলীর অভিমুখে।

সমুদ্রের ধারে, গভীর সমুদ্রের যে জায়গাটিতে ইয়টগুলো নোঙর করে আছে, তাদের মাঝি মাল্লাদের পান-ভোজনের জন্য যে বার রয়েছে, এডরিসের মিনি কুপার তার সামনে গিয়ে থেমে গেল। বার তখন ফাঁকা, লোমশ ভালুকের মতো চেহারা নিয়ে বার-এর মালিক হ্যারী মরিস একাকী বসে একটা রেসিংসীটের নজর রাখছিল। এডরিসকে আসতে দেখে তাকে হাস্য বদনে অভ্যর্থনা জানাল : হাই, টিকি! হঠাৎ কী মনে করে?

এডরিস বলল, একটা ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, হ্যারী। পুলিশী ঝামেলা, দয়া করে প্রশ্ন করো না। শুধু বলল, আমায় জাহাজে তুলে যত তাড়াতাড়ি হয় মেক্সিকোয় পাচার করতে পারবে কিনা?

মরিস বিস্ফারিত নেত্রে এডরিসের মুখ পানে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, এডরিস তার সঙ্গে কোন ঠাট্টা-তামাসা করছেনা তো?কিন্তু না, উদ্বিগ্ন চাউনি ভরা থমথমে মুখের ভাব

তার ঝামেলায় পড়ারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে একটু থেমে বলল, পারব নাই বা কেন? তবে এর জন্য কিছু মালকড়ি খসাতে হবে। আজ রাত দশটা নাগাদ একটা জাহাজ ছাড়ছে।

–কত দিতে হবে?

তিন হাজার ডলার।

এডরিস ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেল। ওহ! এতো অনেক টাকার ব্যাপার। কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচাতে গেলে টাকার ওপর মায়ামমতা করা চলে না। তাই সে মরিসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। বলল, বেশ তাই-ই দেব। আরো একটা উপকার তোমায় করে দিতে হবে, ভাই।

–নিশ্চয়ই করব। বলে কী করতে হবে?

–সাইলেন্সার লাগানো একটা রিভলভার চাই। সেটা হাতে হাতে পেয়ে গেলেই ভালো হয়।

মরিস তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকার পর শুধু জানতে চাইল।

নেবার পেছনে কোন কারণ থাকাই স্বাভাবিক, কী জন্য?

–এ সময় কোন প্রশ্ন নয় হ্যারী। প্লীজ, পারবে তো যোগাড় করে দিতে?

কাঁধ শ্রাগ করে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল হ্যারি। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো হাতে একটা ব্রাউন পেপারের পার্সেল নিয়ে।–তিনশো ডলার।

এডরিস পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে নিঃশব্দে রিভলবারের মূল্য চুকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি। সো লং হ্যারী।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে এডরিস নেমে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লে জেম ফারও নেমে পড়ল। দেখল, এলিভেটর ব্যবহার না করে এডরিস সিঁড়ি অতিক্রম করে ওপরে উঠছে। মনে মনে একটু অবাক হলো জেম। নিজের রুমের কাছে পৌঁছে দরজা খুলে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে এডরিস ডাকল : ফিল! এডরিসের হাতের মুঠোয় ধরা সেদিনের খবরের কাগজ। অন্য হাত পকেটে ঢোকান। সে দেখল, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ফিল। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপাহাতে ধরা তারই রিভলবার। তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সে রিভলবার উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, টাকা এনেছ?।

–তুমি অযথা এতো মাথা গরম করছ কেন বলো তো?পিস্তলনামাও।বলতে বলতে পকেটে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটার সেফটি ক্যাচ সরিয়ে ফেলল এডরিস।

তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। উঁহু, কাছে আসবার চেষ্টা করোনা। টাকা পেয়েছ ইরার কাছ থেকে?

এডরিস মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল, হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। তার আগে এই খবরের কাগজটায় ছাপা তোমার ছবির দর্শন একবার ভালো করে দেখে নাও। পাতা জুড়ে তোমার ফটো। তোমার মুখের কোন দিকই বাদ যায়নি ছবি থেকে।

বলতে বলতে হাতের কাগজটা ছুঁড়ে দিল ফিলের সামনে। কাগজটা আছড়ে পড়ল ফিলের পদযুগলের কাছে।মুহূর্তের জন্য নত চোখে পায়ের কাছে পড়ে থাকা কাগজে নিজের ফটো দেখছে, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এডরিসের ভুল হল না। চকিতে রিভলবার বের করে গুলিবিদ্ধ করল তার শরীরে। পরপর তিনবার। মৃদু আওয়াজও হল : প্লপ-প্লপ-প্লপ।

মাটিতে পড়ে কয়েক সেকেন্ড ছটফট করতে করতে নিথর নিশ্চল হয়ে গেল ফিলের দেহটা। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে, ধীরে ধীরে রক্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে সারা কার্পেটে।

রিভলবারটা পকেটে পুরে ফিলের মৃতদেহের খুব নিকটে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড দেখে–এডরিস যখন বুঝল সত্যিই সে মৃত তখন তাকে সার্চ করার কাজে নেমে গেল। সার্চ করতে করতে টাকাগুলোর দর্শনও পেয়ে গেল। টাকা পরিমাণেও তো প্রচুর। সব পকেটে নেওয়া সম্ভবপর হবে না বলেই একটা ব্যাগে যা ধরার তা চেপে চুপে ভর্তি করে অবশিষ্ট টাকাগুলো পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল এডরিস। তারপর বিলম্ব না করে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা খুলে চমকে উঠল। ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পিছিয়ে এল দু-পা।

দরজার মুখেই রিভলবার হাতে জেম-ফার দাঁড়িয়ে।

–কে তুমি? কী চাও? আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল এডরিস।

–আমি যে হই না কেন, ভেতরে ঢোক তুমি।কর্কশ কণ্ঠে তাকে আদেশের সুরে ধমক দিল জেম।

ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল এডরিস। জেম ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।ফিলের মৃতদেহ তার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ল। মুখের ভাবকঠিন হল। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণের স্রোত বয়ে গেল। এডরিসকে হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দুহাত তুলে দেওয়াল ঘেঁষে পেছন ফিরে দাঁড়াবার জন্য হুকুম জারি করল জেম।

জেম-এর কথা ছাড়া আর কোন বাঁচার উপায় দেখলনা এডরিস। তাই কথামতো এডরিস তার আদেশ পালন করে গেল। সে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ান মাত্রই জেম এক লাফে তার কাছে গিয়ে হাতের পিস্তল দিয়ে সপাটে এডরিসের মস্তকে আঘাত হানল।

.

মিঃ টেরেলের অফিসরুমে বসে লেপস্কি তার তদন্ত কাহিনীর সম্পূর্ণ সারাংশ শুনিয়ে যাচ্ছিলেন সামনে উপবিষ্ট চীফকে। কাহিনী শেষ হলে লেপস্কির দেওয়া নোরেনার ছবিখানা দেখতে দেখতে মিঃ টেরেল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডেভন যাকে নিজের মেয়ে ভেবে বসে আছেন, সে মেয়েটা কে?

–ইরা মার্শ–মুরিয়েল মার্শের সহোদর বোন মিঃ ডেভনের শ্যালিকা, এই তার আসল পরিচয়। জবাবটা বেইগলারই দিলেন চীকে।–কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক পুলিশের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়েছি যে, ইরা মার্শকে সেখানে শেষ দেখা গেছে গতমাসের ১৬ তারিখে। তারপর সে একেবারে বেপাত্তা। তারা ওর সম্পর্কে কোন কিনারা করতে না

পারলেও, আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল। ইরার সন্ধান মিলেছে নিউইয়র্ক থেকে মিয়ামি আসার প্লেনের প্যাসেঞ্জার লিস্টে। এখান থেকেই ইরার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। ফেলে আসা অতীতকে মুছে ফেলে ইরা হয়ে গেল নোরেনা।

কিন্তু কেন? কেন ফিল অ্যালগির তাকে নোরেনা সাজতে বাধ্য করল? কীসের জন্য এই ইমপার্সোনেশান? এই ব্যাপারটাই ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। এর পেছনে এমন এক উদ্দেশ্য নিজেকে আড়াল করে রেখেছে যা সাধনের জন্য ফিল নিজেও খুনী সাজতে দ্বিধান্বিত হয়ে পিছু হটেনি।

-ইরা ওরফে নোরেনাকে ধরলেই এর সঠিক জবাব পাওয়া যাবে।

–উহ, তাড়াহুড়োকরা চলবেনা। আমি আগে ডেভনের সঙ্গে কথা বলে সব কথা তার কাছে খুলে.বলি, তারপর এ ব্যাপারে ভাবা যাবে। এখন মনে হচ্ছে, ঐ বেঁটে বকেশ্বরটা সব জানে। খুব সম্ভব এসবের পেছনে সেই কলকাঠি নেড়েছে। মুরিয়েল মার্শের ড্রেসিং টেবিলে নোরেনার ফটোর পরিবর্তে ইরার ফটো রেখে দেওয়া–এও নিশ্চয়ই তার কারসাজির অন্য একটা দিক। জো! তাকে যত তাড়াতাড়ি পার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা কর।

বেইগলার মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন।

শোন টম! এখান থেকে মিয়ামি যাবার সমস্ত রাস্তা অবরোধ করার বন্দোবস্ত কর। মিয়ামি এয়ারপোর্টের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখ। এডরিস অথবা ফিল আলগির, দুজনের একজনও যেন প্যারাডাইস সিটি ছেড়ে পালাতে না পারে। আমি চললাম ডেভনের সঙ্গে একবার দেখা করতে।

উর্ধশ্বাসে পালাচ্ছিল জেম। এডরিসকে কাবু করে সে কতটাকা হাতিয়েছিল তা গোনবার অবসর পায়নি। তবে তার বুদ্ধিতে সে এটুকু বুঝতে পেরেছিল, লুটের মাল তার পক্ষে আশাতীত হবে। এখানে থাকা আর কোনমতেই নিরাপদ নয়। ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক মনের মানুষ এই এডরিস। ইরার কথাও স্মরণে এল একবার। তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় তাকে সঙ্গিনীরূপে পাশে পেলে মন্দ হতো না। কিন্তু এডরিস ধরা পড়লে ইরাও ঐ জালে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। তাই ইরাকে সঙ্গিনী করলে পুলিশ তাকেও ছেড়ে কথা বলবে না। তার চেয়ে ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। পকেটে টাকা থাকলে আবার মেয়ে মানুষের অভাব!

সামনের গাড়িগুলোর আচমকা গতিবৃদ্ধি ঘটে গেল। তারা শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে যেতেই জেমের চোখে পড়ল সামনে ট্রাফিক লাইট। এখনো সবুজ। কিন্তু জেম এতই অভাগা যে সে বেরিয়ে যাবার আগেই বুজ আলো পাল্টে লাল হয়ে গেল। সজোরে ব্রেক কষতে হলো জেমকে। তাকে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে, পেছনের গাড়িটা অনেক চেষ্টা করেও সামাল দিতে না পেরে মাঝ গতিতে এসে ধাক্কা মেরে বসল জেমের ফোর্ডের ঠিক পেছনে। মহাখাপ্পা হয়ে মাথা ঘুরিয়ে জেম দেখল, একজন স্বাস্থ্যবান বয়স্ক ব্যক্তি ড্রাইভারের সীট অলংকৃত করে বসে আছেন। পরক্ষণেই তার কানে এল পুলিশের বাঁশির আওয়াজ।

ছলাৎ করে বুকের রক্ত চলকে উঠল জেমের। সে তাড়াতাড়ি নিজের প্যান্টের হিপ পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে লুকোতে গেল কিন্তু তার আগেই কানের কাছে গর্জে উঠল একটা বাজখাই কণ্ঠস্বর : থামো!

চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল লালমুখো এক পুলিশের সঙ্গে। সে রিভলবার দেখিয়ে জেমকে বলে উঠল, পিস্তল নামাও! কুইক!

নিরুপায় হয়ে জেমকে নিজের রিভলবারটা ফেলে দিতে হলো নীচে। দুহাত ওপরেও তুলল। ইতিমধ্যে আর একজন পুলিশ এসে দাঁড়ালে তাকে দেখে প্রথম জন বলে ওঠে, ছোকরার কী সাহস! আমাকে দেখে পিল বার করেছিল।

তাই নাকি। জেম কিছু বোঝার আগেই তার গালে বিরাশি সিক্কার এক চড় কষিয়ে দিল। দ্বিতীয়জন। স্টিয়ারিংয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল জেম। নাকে আঘাত কিছু কম হল না, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। মাথা তোলার সময় পর্যন্ত তার ভাগ্যে জুটলনা কারণ মাথা উঁচু করার আগেই হাতদুটো বাঁধা পড়ল হাত কড়ায়।

খানা-তল্লাশী চালাতেই তার পকেট থেকে বেরিয়ে এল মোটা টাকার বান্ডিল। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল নোট ভর্তি ব্যাগ।হ্যাগার্ডদের মতো চেহারা...অথচ সঙ্গে একতারা কাড়ি কাড়ি নোটের বান্ডিল আর হাতিয়ার রূপে অটোমেটিক রিভলবার। তাই দুই আর দুই যোগ করে যোগফল চার আনতে খুব বেশী বেগ পেতে হলনা পুলিশকে। তারা ধরেই নিল সে একজন অপরাধী। হয় চুরি না হয় ডাকাতি। চলল সোজা থানায়।

.

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল এডরিস। মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। প্রথমটা স্মরণে আনতে। পারছিল না কেমন করে এমন দশা হয়েছে...শুয়েই বা কেন...।

আস্তে আস্তে সব কাণ্ড কারখানা চোখের সামনে একে একে জীবন্ত হয়ে উঠল। দুঃখ, হতাশায়, ভয়ে আর সবশেষে যন্ত্রণার তারশে সেঝাঁকিয়ে উঠল। কয়েক মিনিট পরেই সে উঠে বসল। তার চোখ পড়ল মরে পড়ে থাকাফিলের প্রতি। অকস্মাৎ অজানা এক ভয় তার মনকে তোলপাড় করতে লাগল। চোখ ফিরিয়ে সে আস্তে আস্তে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে চলল ওয়াইন ক্যাবিনেটের দিকে। কড়া টাইপের ২/১ পেগ হুইস্কি এ সময়ে পেটে পড়লে দেহ মনের দিক থেকে সে একটু সুস্থ হতে পারবে।

হুইস্কি খাওয়ার পর দেহ মনে বল পেল, আগের অবস্থা কাটিয়ে বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এল এডরিস। স্নান সেরে নিল। তারপর ঘরে এসে নিজের প্রিয় আর্মচেয়ারটিতে বসে নিবিষ্ট মনে ভাবনার জাল বুনতে শুরু করে দিল :

মেক্সিকোয় পালাবার মতন টাকা বর্তমানে তার নেই। নতুন করে ছক কষে সাফল্য পাবারও কোন সার্থকতা নেই!বৎস টিকি!তুমি এবার বড় ধরণের গাড্ডায় পড়েছ। সহজে যে গাড়া থেকে মুক্তি মিলবে, সে আশা করাও বৃথা। সব-সব প্ল্যান ভেস্তে গেল ঐ কুত্তীর বাচ্চা, অপদার্থ ফিলের জন্য। তোমার চালে কোন ভুল ছিল না। অন্যের দোষে যদি তোমার সাজানো মতলব বানচাল হয়ে যায়, তাতে তোমার কী দোষ থাকতে পারে? ওর যোচ্য শাস্তি ওকে দেওয়া হয়েছে। এবার নিজে শাস্তি পারার জন্য প্রস্তুত হও। আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আরও বেশ খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢালল এডরিস। নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। আরও হুইস্কি...আরও...

বেইগলার আর হেস তার হাতে যখন কড়া পরিয়ে দিলেন তখন সে বদ্ধ মাতাল।

.

ইরা পত্র লিখছিল মেলকে

ডীয়ার মেল,

মনে বাসনা থাকলেও আমি কখনো আর তোমাকে ড্যাডি বলে ডাকতে পারব না। ডাকার অধিকার আমার ভাগ্যে জুটবে কী? সব কিছু প্রকাশ হওয়ার পর ড্যাডি বলে ডাকা তখন বোধহয় সমীচিন হবে না। তাই নাম ধরেই মেল সম্বোধন করলাম। যাইহোক, এতোদিন ধরে যা করেছি। তারজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, অনুতপ্ত। তোমার সামনাসামনি হওয়ার মুখ আমার নেই। বিদায় জানানোর জন্যই শেষপর্যন্ত এই পত্রের দ্বারস্থ হতে হল।

তুমি হয়তো আমার কোন কথাই আজ বিশ্বাস করবেনা, আমি জানি। কিন্তু তবুবলছি, তোমার মেয়ে নোরেনারও প্রাণ যে ওরা নিয়েছে–সত্যিই আমি জানতাম না। ওরা আমার মনে এই বিশ্বাসের বীজ বপন করেছিল যে নোরেনার মৃত্যু জলে ডুবে আকস্মিক ভাবেই হয়েছে। মৃত্যুটা ছিল কেবলমাত্র নিছক এক দুর্ঘটনা।

আমি জানি, তার মৃত্যুর খবর শোনার পরও নোরেনা সাজা আমার উচিত হয়নি। তাই অল্প বয়সেও আমি আমার এই ছোট্ট জীবনে এমন বহু ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, যেগুলো অনুচিত জেনেও করতে বাধ্য হয়েছি। নোরেনা সেজে যে স্নেহ মমতা আমি পেয়েছি তা জীবন-ডোর ভোলার নয়। আমার মতন নষ্ট মেয়ের ভাগ্যে এত সুখ প্রাপ্য ছিল না বলেই এই অল্প দিনের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি তা ফুরিয়ে গেল।

আমি এখন চলেছি নীল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে। হাত-পা যতক্ষণ না অবশ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম ধারায় সাঁতার কেটেই চলব। আশা করি, এভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে অবসন্ন দেহে যদি সমুদ্রে তলিয়েও যাই এর থেকে সুখের সংবাদ আর কি হতে পারে! আমার মতন মেয়ের মৃত্যু এভাবে ঘটলে অনেকে অনেক কিছু জটিল ঝামলার হাত থেকে সহজেই মুক্তি পেয়ে যাবে।

তবে একটাই দুঃখ অন্তরে থেকে যাবে চিরকাল, তা হল আমি মারা গেলে আমার জন্য তোমার মনে বিন্দুমাত্র বেদনার সঞ্চার করবে কিনা। তবে কেন জানিনা, আমার মন বলছে আমার জন্য তুমি হয়ত গোপনে একবার না একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই।

জয় খুব ভালো মেয়ে। ওকে তুমি বিয়ে করতে ভুলো না যেন, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব তোমার অতীত যন্ত্রণা মুছে দিয়ে তোমাকে সুখী করতে পারা।

গুডবাই মেল, আমার শেষ এবং একটা অনুরোধ, তুমি অন্ততঃ মনে এই বিশ্বাস রেখো যে, আমি যদি নোরেনার বিষয়ে সামান্যতম আঁচও পেতাম যে, তাকে এ পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে একাজ করার জন্য কখনোই আমি রাজী হতাম না।

–ভালোবাসা নিও

ইরা।

পত্রলেখা শেষ হলে, মুড়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে টেবিলে রেখে কেবিন থেকে নীরবে বেরিয়ে এলোইরা। মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের যে ঢেউই তোলপাড় করুক, বাইরের

ভাবভঙ্গীতে তার প্রকাশ ছিল না বিন্দুমাত্র। শেষবারের মতন বহু স্মৃতি বিজড়িত কেবিনটাকে দেখে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সমুদ্র বক্ষের দিকে। উন্নত উঁচু মস্তক, সংকল্পে স্থির, নির্ভীক দৃষ্টি। সমুদ্রের জলে নেমে সে তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিল। সমুদ্র তীর পেছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে গেল যেখানে শুধু জল আর জল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল নতুন সেই জীবন, যে জীবন পাওয়ার কথা তার ছিল না, তবু সাময়িক হলেও সে জীবন ধরা দিয়েছিল। সামনে পেছনে যেদিকে তাকাক শুধু জল আর জল। অগাধ, অনন্ত আর অসীম। কিন্তু ইরার চোখে বিন্দুমাত্র জলকণা পর্যন্ত ছিল না।